সাধক-জীবনী—

চৈতন্য-চরিত।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ
চৈতন্য।

শ্রীবেণীমাধব বক্‌শী দ্বারা
প্রকাশিত।

কলিকাতা
৪৬ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট ইডেন প্রেসে,
শ্রীসাতকড়ি দাস দ্বারা মুদ্রিত।

অগ্রহায়ণ শকাব্দা ১৮০৬।

উৎসর্গ পত্র।

হরিনাম

দ্বারে দ্বারে কীর্ত্তন করিয়া, ঘরে ঘরে প্রচার করিয়া,

প্রীতি, পবিত্রতা [illegible] না

শান্তি, সাম্যতত্ত্ব

সংস্থাপন করিতে যে জীবনের অবসান,

আজ

প্রাণের আগ্রহের সহিত

বঙ্গবাসী

নরনারীর হস্তে

সেই

মহাপুরুষের জীবন কাহিনী

চৈতন্য-চরিত

অর্পণ করিলাম।

গ্রন্থকার।

প্রিয়তম,——

"চৈতন্য-চরিতের" পাণ্ডুলিপি আদরের সঙ্গে পড়িলাম। রোগে, শোকে, পাপে, বিকারে বঙ্গবাসী আকুল; অধর্ম্মে স্বেচ্ছাচারে বঙ্গভূমি পরিপূর্ণ—এই ঘোর দুর্দ্দিনে চৈতন্য-চরিত যে বঙ্গবাসীর কত আদরের ধন তাহা বলিতে চাহিনা। কিজন্য সংসারে আসিয়াছিলাম, কি করিয়া সংসার হইতে বিদায় লইতেছি; কেমন স্বর্গের পবিত্রতা হাতে পাইয়াছিলাম, কেমন নরকের কলঙ্কে তাহা পরিণত করিয়াছি; যিনি দিনান্তে, নিশান্তে, বা জীবনেও কখন একবার সেকথা ভাবিয়াছেন, তিনিই বুঝিবেন চৈতন্য-চরিত কি উপাদেয় গ্রন্থ। ভাষায় আড়ম্বর চাহি না, শব্দবিন্যাসের চাতুরী বুঝি না; যাহাতে পাষাণমন বিচলিত হয়, অন্ধচক্ষু প্রস্ফুটিত হয়, পাপতাপপূর্ণ জীবন পরিবর্ত্তিত হয়, তেমন কথা শুনিতে চাই। চৈতন্য-চরিতে তাহার অভাব নাই। তোমার পাঠকের হাতে চৈতন্য-চরিত কিরূপ আদর পাইবে জানিনা, কিন্তু যদি সহস্রের মধ্যেও একজন আপন জীবনের দিকে চাহিয়া গ্রন্থখানি পাঠ করেন, আশা করি ভগবানের নামে শত শত জগাই মাধাই উদ্ধার হইয়া যাইবে। তুমি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছ, তাহার প্রশংসা করিলাম না, কেবল প্রাণের সঙ্গে প্রার্থনা করি ভগবান তোমার সহায় হউন। ইতি

রাজসাহী — শুভাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতা

২রা কার্ত্তিক ১২৯১ সাল — শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

অবতরণিকা

জড় জগতের ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে বৃহত্তম গ্রহ, উপগ্রহ সকলেই এক অদৃশ্য অথচ অলঙ্ঘ্য আকর্ষণে আবদ্ধ। এই আকর্ষণের বলে গ্রহ, উপগ্রহ আপন আপন কক্ষে থাকিয়াও সমস্ত সৌর জগতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছে—কি চন্দ্র সূর্য্যের উদয়াস্ত, কি বিভিন্ন ঋতুর ক্রমিক বিবর্ত্তন সকলই এই মূল আকর্ষণের দূর-সম্পর্কীয় অথচ অবশ্যম্ভাবী ফল। দেশ কাল ও শিক্ষা ভেদে ভিন্ন ব্যবসায়ী বিভিন্ন প্রকৃতি মানবসন্তানেরাও যে সমাজ বাঁধিয়া এক পরিবারের ন্যায় বাস করে তাহার মূলে ও এই শক্তি বর্ত্তমান। জড় জগতের পক্ষে মাধ্যকর্ষণ আর মানব সমাজের পক্ষে ধর্ম্মই একমাত্র বন্ধন রজ্জু। মাধ্যাকর্ষণ কেহ দেখিতে পায় না; ধর্ম্মের বন্ধনরজ্জুও চর্ম্ম-চক্ষুর অগোচর; কিন্তু যখনই সেই বন্ধন রজ্জু শিথিল হয়, সমগ্র সমাজ-ব্যাপী ভীষণ আন্দোলনে তখনই পৃথিবী থর থর কাঁপিয়া উঠে। মানব যখন ধর্ম্মের সিংহাসনে স্বার্থের পুত্তল বসাইয়া সাদরে তাহাদের উপাসনায় মত্ত হয়; ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম, ন্যায়ের নামে অন্যায়, প্রেমের নামে হিংসা যখন সমাজের অস্থি মজ্জার সঙ্গে মিশিয়া যায়; তখনই সোনার সংসার দুঃখের হাহাকারে

ডুবিয়া পড়ে, আদরের নন্দন কানন নরকের বীভৎস দৃশ্যে পরিণত হয়—জগৎ হইতে মনুষ্যজীবনের মহত্ত্ব, ধর্ম্মের বিশ্ববিজয়ী প্রতাপ বিলুপ্ত হয়। কিন্তু এ সকলই ক্ষণেকের জন্য। ঝটিকার পর শান্তি, অমানিশার পর পৌর্ণমাসী যাঁহার প্রাকৃতিক নিয়ম, তাঁহারই মঙ্গলময় অলংঘ্য শাসনে ধীরে ধীরে ছত্রভঙ্গ সমাজ আবার ধর্ম্মবন্ধনে আপনা আপনি আবদ্ধ হয়। আস্থাবান্ হিন্দু বিশ্বাস করেন যুগে যুগে এই ধর্ম্ম-সামঞ্জস্য বিধানের জন্যই ভগবানের অবতার, এই জন্যই ভগবান বলিয়াছেন ;—

"পরিত্রাণায় চ সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

বস্তুতঃ স্বেচ্ছাচারী মনুষ্য সন্তান কখন কখন দুর্ব্বল হস্তের ক্ষুদ্র আবরণে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী মার্ত্তণ্ডদেবকেও বিলুপ্ত করিতে চেষ্টা করে, পাপে, ব্যভিচারে, পুণ্যময় সংসারকে রসাতলে ডুবাইতে আড়ম্বর করে, কিন্তু মঙ্গলময় বিধাতার ইচ্ছায় পরিণামে হলাহল অমৃতহ্রদে পরিণত হয়। তাঁহার ইচ্ছাতেই ঘোর স্বেচ্ছাচারী সমাজ হইতে ধর্ম্মের পতাকা বহন করিয়া সমাজ সামঞ্জস্যের মূলমন্ত্র গান করিতে করিতে স্বার্থত্যাগী ধর্ম্ম-বীর জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধদেব, রামানুজ, নানক, মহম্মদ, লুথার ও কবীরের জীবনই ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। পাপ-পুণ্যের ভীষণ সংঘর্ষণই সংসারে দেবাসুরের যুদ্ধ ;—এ যুদ্ধে ধার্ম্মিক মহাপুরুষের জয়, পাপীর বন্ধন দশা। এই জন্যই মহাপুরুষদিগের

জীবন সমাজের প্রাণে মৃত সঞ্জীবনী-শক্তি ঢালিয়া দেয়। যত-দিন সমাজ ততদিন এই শক্তির সর্ব্বত্র জয়।

কিঞ্চিদূন চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে মৃতপ্রাণ বঙ্গসমাজে এই শক্তি সঞ্চারিত করিবার জন্য চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। এক দিন যাঁহার প্রেমপ্লাবনে ও ভক্তির উচ্ছ্বাসে ভারতের উত্তপ্ত শ্মশান সৈকত ভাসিয়াছিল, আজও যাঁহার ভক্তি গানের মধুর ঝঙ্কার বঙ্গবাসী অসংখ্য নরনারীর হৃদয় কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, সে মহাত্মার জীবনকাহিনী বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির দিনেও ঘোর অন্ধকারে পড়িয়া রহিয়াছে, ইহা কম দুঃখের কথা নহে। সরস্বতীতীরে ব্রহ্মাবর্ত্তের কুশময় ভূমিতে যে সময়ে আর্য্য-পরমার্থ-তত্ত্বের প্রথম বিকাশ সে সময়ের ইতিহাস আমরা দেখিতে পাই নাই। ব্রহ্মাবর্ত্তে যে পরমার্থ-তত্ত্বের জন্ম, বদরিকাশ্রমে তাহার বাল্যলীলা, নৈমিষারণ্য-ক্ষেত্রে তাহার পৌগণ্ডকাল, কাবেরীর রমনীয় উপকূলে যৌবন বিকাশ, পরিশেষে সুরধনী-তটে নবদ্বীপনগরে তাহার চরম উন্নতি। মাতৃভূমির গৌরবক্ষেত্র এই নবদ্বীপধামেই চৈতন্যের জন্ম হয় এবং ইনিই সেই পরমার্থতত্ত্বের চরম উন্নতির নেতৃ-পুরুষ

প্রায় তিনশতবর্ষ অতীত হইল, থানেশ্বরের যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতের গৌরবমণ্ডিত উন্নত মুকুট মুসলমানের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ব্বগৌরব, পূর্ব্বশিক্ষা ইস্‌লাম ধর্ম্মের তরুণ প্লাবনে ভাসিয়া

গিয়াছে—ভারত আজ পরাধীনতায়, স্বেচ্ছাচারে, অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন! অতিজ্ঞান বহুল বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ নিশ্বাসটীও ভারত হইতে তিরোহিত হইয়াছে, সনাতন ধর্ম্মের ক্রিয়াকলাপ, জাতিভেদের প্রবল প্রতাপ, পৌরহিত্য প্রথার নবীন বিক্রম ভারতের সর্ব্বত্র, অদম্যশাসনে ধর্ম্মরাজ্যে বিচরণ করিতেছে। মুসলমানের অত্যাচারে, রাষ্ট্রবিবর্ত্তনের আলোড়নে ভারত ব্যাপিয়া পাপের রাজত্ব স্থাপিত হইয়াছে। তরবারিমুখে কোরাণের ধর্ম্মপ্রচার, সবলের কবলে দুর্ব্বলের অকাল মৃত্যু, ধর্ম্মের নামে স্বার্থপর পুরোহিত শ্রেণীর আড়ম্বর পূর্ণ কুসংস্কার ধীরে ধীরে বিস্তৃত ভারতবর্ষ ঢাকিয়া তামসযুগের ঘন আবরণ টানিয়া দিয়াছে। এই সময়ে চৈতন্যদেব জন্ম গ্রহণ করিলেন। যখন বাহ্যক্রিয়া কাণ্ড লইয়াই সমাজ পরিতৃপ্ত, যখন পুস্তক ও ব্যবস্থাগত ধর্ম্মের দোহাই দিয়া বঙ্গবাসীগণ ঘোর স্বেচ্ছাচারে নিমগ্ন, যখন তান্ত্রিক উপাসনার অমানুষিক কঠোরতায় ও ঘোর অত্যাচারে বঙ্গভূমি পরিপূর্ণ, যখন রক্তত্রিপুণ্ড্রকধারী লোহিত লোচন কাপালিকের খড়্গাধারে মানবশোণিতে দেবতার পূজা, হতভাগিনী জন্মভূমির সেই একদিন!! তখন পাশ্চাত্যজ্ঞানের আলোক ভারতে প্রবেশ করিবে কি ইউরোপবাসীগণই ভাল করিয়া সভ্যতা জ্ঞান ও স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করেন নাই; তখন ফ্রাঙ্কলিন, ওয়াসিংটন, নেপোলিয়ন, ওয়েলিংটন প্রভৃতি রণবীরদিগের ঊর্দ্ধতম পিতৃপুরুষের ও জন্ম হয় নাই; গৃহবিবাদে,

স্বার্থযুদ্ধে, ধর্ম্মকলহে ইউরোপের ঘরে ঘরে তখন বিভীষিকা পরিপূর্ণ শ্মশানের দৃশ্য—উন্নত ও স্বাধীনচেতা ইউরোপ তখনও পোপের স্বর্ণসিংহাসন চুম্বন করিয়া, অগ্নিমূল্যে ব্যবস্থাপত্র ক্রয় করিয়া ধর্ম্মসোপানের ও উন্নতিপথের পাথেয় সংগ্রহে ব্যস্ত—জগতের সেই একদিন! সেই দিনে—যে দিন ইউরোপের উপকূলে বসিয়া সুদূর পশ্চিম সাগরের উত্তাল তরঙ্গমালার অন্তরালে নাবিক প্রবর কলম্বস আমেরিকার ভাবী আবিষ্কার দর্শন করিয়া পুলকিত হইতেছিলেন;—যেদিন পোপের সিংহাসন কাঁপাইয়া ইউরোপের ধর্ম্ম সংস্কারের প্রবল ঝটিকার প্রথম সূত্রপাত আরম্ভ হইতেছিল; যেদিন অত্যাচারী লোদিরাজগণের ভস্মস্তূপের উপর মোগল বাদসাহ ভারতে আত্মসিংহাসন সংস্থাপনে ব্যতিব্যস্ত—সেই দিনে আঁধার বঙ্গভূমের উজ্জ্বল রত্ন চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। পঞ্চনদের গিরিশঙ্কটে ধূলাখেলা ছাড়িয়া ভবিষ্যৎ শিখগুরু নানক সাহ যখন ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পণ করিতেছিলেন চৈতন্য সেই সময়ে জন্ম গ্রহণ করিলেন। বঙ্গভূমির নবদ্বীপনগরে চৈতন্য, আর সাক্সনীর ইস্লিবেন নগরে মার্টিন লুথার—একই সময়ে ধূলাখেলায় মধুর শৈশব অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

একদিকে উত্তপ্ত শোণিতে ভারতের শ্যামলক্ষেত্র রঞ্জিত করিয়া নবীনপ্রতাপে ইস্লাম ধর্ম্ম বিস্তৃত হইতে লাগিল, অন্য দিকে শুষ্কক্রিয়াকাণ্ডপরায়ণ হিন্দুসমাজ ক্রমেই ধর্ম্মনৈতিক

পরাধীনতায় পড়িয়া পরকালের ভার গুরু পুরোহিতের উপর চাপাইয়া দিয়া তামসিক উৎসবের বাহ্যআড়ম্বরে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন। এই বিষম সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া মহাপুরুষ কবীর মাতৃভূমির দুর্গতি দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সত্য প্রচার করিতে লাগিলেন। কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেই প্রকৃত পথ ফেলিয়া বাহ্য ক্রিয়াকাণ্ডে অন্ধ হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া কবীর প্রচার করিলেন। "ভাই! বাহ্য আড়ম্বরে কিছু হইবে না। নমাজের জন্য হাতমুখ প্রক্ষালণ, হরিনামের জন্য মালাজপ, প্রায়শ্চিত্তের জন্য পুণ্যসলিলা স্রোতস্বতীতে অবগাহন, দেবমন্দিরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া কিছু হইবে না; যদি উপাসনায় বা তীর্থভ্রমণে হৃদয়গত প্রবঞ্চনা থাকে, যদি জীবনের দিকে না চাহিয়া ব্যবস্থার দিকে চাহিয়া থাক, কিছুতেই কিছু হইবে না। হিন্দু একাদশীর উপবাস করেন, মুসলমান রমজানের দিনে নিরম্বু পড়িয়া থাকেন; কিন্তু ভাই অবশিষ্ট তিথি ও মাস কাহার সৃষ্ট যে তোমরা কেবল একটিমাত্র তিথি ও মাসই মানিয়া চলিবে? ভগবান যদি কেবল মন্দির বিশেষে আবদ্ধ থাকেন তবে ভাই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড কাহার মন্দির? পূর্ব্বদিকে কাশীধামে হিন্দুর ও পশ্চিমে মক্কায় মুসলমানের তীর্থস্থান—কিন্তু ভাই! একবার আপন হৃদয়রাজ্য খুঁজিয়া দেখ, হিন্দু মুসলমানের প্রিয়তম দেবতা সেখানেই বিরাজিত রহিয়াছেন। যিনি রাম রহিম উভয় উপাসকের পিতা, তিনিই আবার জগতের পিতা—তিনি এক,

তিনি মহান্, তিনি অদ্বিতীয়। তিনিই আবার দেবতা, তিনিই গুরু।" এই অমূল্য উপদেশ বিতরণ করিতে করিতে কবীর পরলোক গমন করিলেন এই ভাবে অর্দ্ধ শতাব্দী চলিয়া গেল। বঙ্গসমাজ আবার গভীর আঁধারে ডুবিয়া পড়িল। এই অ্যুধার জন্মভূমির পাপতাপ দূর করিবার জন্য অমিত আধ্যাত্মিক বল লইয়া চৈতন্যদেব উপস্থিত হইলেন। যে মহাপুরুষের ধর্ম্ম-জীবন নানাগুণে ধার্ম্মিক সমাজের পূজনীয়, আজ নবজাগরিত বঙ্গসমাজে তাঁহার আদর্শ জীবন গৃহে গৃহে সাদরে পূজিত হউক ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

চৈতন্য-চরিত।

প্রথম অধ্যায়।

জন্ম ও শৈশব।

১৪০৭ শকে ১৯ শে ফাল্গুন শুক্রবার সন্ধ্যার সময় নবদ্বীপে চৈতন্যদেব জন্ম গ্রহণ করেন। এই মহাপুরুষের জন্মদিনে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল, তদুপলক্ষে গঙ্গাস্নানের জন্য রাঢ় ও পূর্ব্ব-দেশের অসংখ্য নরনারীতে নবদ্বীপ সে দিন লোকে লোকারণ্য। মুহুর্মুহু হরিধ্বনিতে ও নবদ্বীবাসিগণের মঙ্গলাচরণে চৈতন্যের জন্ম দিন পর্ব্বদিনের ন্যায় লক্ষিত হইয়াছিল। মহাপুরুষ-দিগের জন্ম দিনে ভাবী জীবনের শুভসূচক লক্ষণ স্বতঃই দৃষ্ট হয়; কুমারসম্ভব, রঘুবংশ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এরূপ বর্ণনা অনেক পাওয়া যায়, তবে অধিকাংশই কবিকল্পিত বলিয়া কাহারও তাহাতে আস্থা নাই। চৈতন্যের জন্ম দিনেও অপ্সরা-গণ স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিল; সাবিত্রী, গৌরী, সর-স্বতী, অরুন্ধতী প্রভৃতি দেবীগণ ছদ্মবেশে নবদ্বীপে উপস্থিত

হইয়া চৈতন্যকে দেখিয়াছিলেন ; কিন্তু এ সকল অতিরঞ্জিত ও অমূলক বর্ণনায় মনোযোগ দিবার প্রয়োজন নাই। চৈতন্যের পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র ; শ্রীহট্ট দেশ তাঁহার জন্মস্থান। তিনি গঙ্গাস্নান উপলক্ষে নবদ্বীপে আসিয়া নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা শচীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন ; পুনরায় স্বদেশে না গিয়া তীর্থবাসের জ নবদ্বীপেই বাস করিতে থাকেন। চৈতন্য শচীদেবীর দশম সন্তান ; উপর্য্যুপরি আটটী কন্যা শৈশবকালে গতাসু হইলে বিশ্বরূপ নামে এক পুত্র জন্মে ; তৎপরে ত্রয়োদশ মাসের গর্ভে চৈতন্যের জন্ম হয়। নবদ্বীপবাসিগণের মহা আনন্দের মধ্যে বঙ্গের ধর্ম্মবীর চৈতন্য জন্ম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য দেখিয়া লোকমাত্রেই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন ; না হইবেন কেন—যিনি পরিণত বয়সে সমগ্র বঙ্গদেশকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন ভূমিষ্ঠ হইয়া তিনি যে সর্ব্বজন-মোহন হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! অলোক-সামান্য সুকুমার শিশুর জন্মের কথা নবদ্বীপের ঘরে ঘরে প্রচারিত হইল। দলে দলে বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বর্ষীয়সী সকলেই চৈতন্যকে দেখিবার জন্য মিশ্র ভবনে উপস্থিত, অল্প সময়ের মধ্যেই মিশ্র-ভবন লোকারণ্য হইয়া উঠিল। অনুপম মিশ্রকুমারকে দেখিয়া সকলেই মিশ্র ঠাকুর ও শচীদেবীর সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে করিতে বাটী চলিয়া গেল। সন্তান-বিয়োগ-বিধুরা শচীদেবীর আর আনন্দের সীমা থাকিল না ;

পুত্রের অদৃষ্টপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দর্শনে জনক জননী সমস্ত পূর্ব্বশোক বিস্মৃত হইলেন। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এরূপ লিখিত আছে যে পুত্রের জন্মোপলক্ষে মিশ্র ঠাকুর অনেক দ্রব্য উপহার পাইয়াছিলেন; সে সময়ের ধর্ম্মভীরুতা ও দেবভক্তির বিষয় মনে করিলে একথা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। প্রচলিত বিধি অনুসারে চৈতন্যের জাতকর্ম্মাদি নিষ্পন্ন হইল। পুত্রের অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ ও সুলক্ষণ দেখিয়া শচীদেবীর পিতা বিশ্বম্ভর নাম রাখিলেন। আমাদের দেশে বহুদিনের একটী প্রথা প্রচলিত আছে; নাম করণের সময় শিশুর সম্মুখে বহুমূল্য দ্রব্যাদি রাখিতে হয়, লোকের বিশ্বাস যে শিশু সম্মুখস্থ দ্রব্যাদির মধ্যে অগ্রে যেটী স্পর্শ করে পরিণত বয়সে সে তাহাই লাভ করে। এরূপ কথিত আছে যে নাম করণের দিন চৈতন্যকে যে সকল দ্রব্য স্পর্শ করাইতে দেওয়া হয় তন্মধ্যে তিনি স্বেচ্ছাক্রমে ভাগবত গ্রন্থ লইয়া খেলা করিয়াছিলেন। এ ঘটনায় সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে বালকটী শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্ম্মপরায়ণ হইবে। এই সময় হইতেই চৈতন্যের ধর্ম্মভাবের চিহ্ন লক্ষিত হইতে থাকে। চৈতন্যদেব বাল্যকালে অনেক নামে আখ্যাত হইতেন; প্রতিবেশীদিগের মধ্যে কেহ বা তাঁহাকে "নিমাই" কেহ বা "গৌরহরি" বলিয়া ডাকিত। এরূপ ভিন্ন ভিন্ন নাম রাখিবার কারণ ছিল; তিনি গৌরবর্ণ ও অনুপম সুপুরুষ ছিলেন বলিয়া স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে আদর করিয়া "গৌরহরি"

বলিত। কেহবা ডাকিনী শাকিনীর ভয়ে কেহবা শেষ পুত্র জন্য "নিমাই" বলিয়া ডাকিত। বৈষ্ণবেরা গৌরচন্দ্র, নবদ্বীপচন্দ্র মহাপ্রভু প্রভৃতি নানা নামে চৈতন্যকে সম্বোধন করিয়া থাকেন। শাক্যসিংহ যেমন ধর্ম্ম জগতে বুদ্ধদেব নামে পরিচিত, নিমাইও তদ্রূপ চৈতন্য নামে ধর্ম্ম জগতে চিরপ্রসিদ্ধ। আমরাও তাঁহাকে কেবল চৈতন্য আখ্যা দিয়া তাঁহার মহৎ জীবনের কথা বলিব।

দিনে দিনে নবজাত সুকুমার শিশুর কোমল অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি যেমন বাড়িতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে জননীর আশালতাও তেমনি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বঙ্গদেশের শেষ রত্নের জ্যোতিঃ এইরূপে সাধারণের অলক্ষ্যে মিশ্র কুটীরে বিকসিত হইতে লাগিল। শৈশবাবস্থা হইতেই তাঁহার হৃদয়ে কেমন ধর্ম্মভাব নিহিত হইয়াছিল যে তিনি যখন কাঁদিতেন নিকটস্থ রমণীগণ হরিবোল দিয়া চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিত তিনি তৎক্ষণাৎ শান্ত হইতেন ও হাঁসিয়া তাহাদের কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেন। গ্রামের মধ্যে এই কথা প্রচারিত হইলে সকলেই ইচ্ছা পূর্ব্বক চৈতন্যকে কাঁদাইতেন এবং পরক্ষণেই হরিবোল দিয়া হাঁসাইতেন। চৈতন্যের শৈশব-লীলা এত অমানুষিক ঘটনায় পূর্ণ যে তৎসমুদয় সাধারণের বিশেষতঃ বর্ত্তমান শতাব্দীর বিশ্বাস যোগ্য নহে।

এইরূপে ভাবী ধর্ম্মবীর চৈতন্যের শৈশবকাল অতিবাহিত হইতে লাগিল। এই ভাবী মহাবীরের বাল্য প্রকৃতি কিরূপ

ছিল; কিরূপেই বা উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া ধর্ম্মবীরোপযোগী হইল, তাহা বিবৃত করা জীবন চরিত লেখকদিগের একটী কর্ত্তব্য। চৈতন্যদেব বাল্যকালে অত্যন্ত অস্থির ও দুর্দ্দান্ত ছিলেন, প্রতিবাসিগণের প্রতি যথেচ্ছ অত্যাচার করা তাঁহার নিত্য কর্ম্ম ছিল। প্রতিবাসীর ঘরে অজ্ঞাতসারে গিয়া খাদ্য সামগ্রী চুরি করিতেন, ধরা পড়িলে বিনতভাবে ক্ষমা চাহিয়া, পা ধরিয়া কখন বা আর করিব না বলিয়া মুক্তিলাভ করিতেন। ক্ষমা ও বিনয় তাঁহার প্রকৃতিগত ভূষণ ছিল, এই জন্যই শত অপরাধ করিলেও লোকে তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইত না। ঘরে স্থির হইয়া থাকা তাঁহার অভ্যাস ছিল না; সদা সর্ব্বদা এদিক ওদিক করিয়া পরের অনিষ্ট চেষ্টায় ফিরিতেন। তিনি পাড়ার দুরন্ত বালকদলের দলপতি ও দুঃসাহসিক কার্য্যে অগ্রগামী ছিলেন। তিনি কাহাকেও দেখিয়া ভীত বা সঙ্কুচিত হইতেন না; কেবল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্মুখে নীরবে থাকিতেন। তিনি সদলে গঙ্গার ঘাটে গিয়া ধ্যানমগ্ন লোকদিগের পূজার দ্রব্যাদি লইয়া দূরে ফেলিয়া দিতেন এবং জল কিম্বা বালুকা ছড়াইয়া ধ্যান ভঙ্গ করিতেন; স্নাতকদিগের শুষ্ক বস্ত্রাদি গোলমাল করিয়া রাখিতেন বা স্থানান্তরিত করিতেন। কুলকুচির জল দিয়া ঘাটের লোকদিগকে পুনঃ পুনঃ স্নান করাইতেন; ডুব দিয়া জলের মধ্যে কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই পা ধরিয়া টানিতেন। পূজার আসনে উপবেশন, অলক্ষিত ভাবে

নৈবিদ্য ভক্ষণ, পণ্ডিতদিগের পুঁথি অপহরণ, প্রভৃতি অত্যাচারে ঘাটের লোককে বিধ্বস্ত করিয়া তুলিতেন। ছোট ছোট বালক বালিকারাও তাঁহার অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইত না। তিনি তাহাদিগের গায়ে কাদা দিয়া, কানে জল দিয়া, গায়ে ধাক্কা দিয়া কাঁদাইতেন। ঘাটের সকলেই উপদ্রুত হইয়া শচীদেবীর নিকট চৈতন্যের ব্যবহারের জন্য অভিযোগ করিত, তিনি অভিযোগকারীদিগকে মিষ্টবাক্যে বুঝাইয়া "আর করিবে না" বলিয়া বিদায় দিতেন। জগন্নাথ মিশ্র সময়ে সময়ে পুত্রের অত্যাচারে ক্রুদ্ধ হইয়া শাস্তিবিধানের চেষ্টা করিতেন; কিন্তু শচীদেবীর কাতরতায় কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। বাটীতে স্থির হইয়া থাকিবার জন্য একদিন শচীদেবী তাঁহাকে খই ও কলা দিয়া গঙ্গাস্নান করিতে যান, গৃহে আসিয়া দেখেন যে, নিমাই খৈ ও কলা দূরে রাখিয়া মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেছেন, শচীদেবী বিরক্ত হইয়া বলিলেন নিমাই! থাবার দ্রব্য ফেলিয়া কেন এ মাটী খাইতেছ? চৈতন্য বলিলেন কেন মা খাবার দ্রব্য ও মাটী দুইতো একই পদার্থ একটী অন্যটীর বিকৃত ও রূপান্তরিত অবস্থা ভিন্ন আর কি! সকল দ্রব্যই মাটী হইতে, এবং সকলই লয় পাইয়া মাটীই হয়। শচীদেবী পুত্রের গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইলেন আর কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না।

চৈতন্য সর্ব্বদাই পথে পথে বেড়াইতেন ও লোকের সঙ্গে

কলহ করিতেন। তাঁহার গায়ে সর্ব্বদাই স্বর্ণালঙ্কার থাকিত এক দিন চৈতন্য পথে পথে বেড়াইতেছেন এমন সময় দুই জন চোর তাঁহার গায়ের অলঙ্কার অপহরণ ইচ্ছায় তাঁহাকে খাদ্য সামগ্রীর লোভ দেখাইয়া বিপথে লইয়া যায়। চোরদ্বয় সুকুমার বালকটীকে কেমন করিয়া মারিবে এই চিন্তায় ইতস্ততঃ করিতে করিতে জগন্নাথ মিশ্রের বাটীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহাদের অভিসন্ধি পূর্ণ হইল না; এইরূপে তিনি অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা পাইলেন।

চৈতন্যের পিতা মাতা পরম বৈষ্ণব ছিলেন; নবদ্বীপে সে সময়ে প্রায় সকলেই শক্তির পূজা করিতেন ও তদনুযায়ী আচার ব্যবহার করিতেন কিন্তু প্রাচীন গ্রীসের মত সে সময়ে অতিথি সৎকার করা পুণ্যের কায বলিয়া সকলের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। অতিথি ফিরিয়া গেলে বা তাঁহার অভ্যর্থনার কোন ত্রুটী হইলে পারত্রিক অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী ইহা সকলেই স্বীকার করিতেন। কথিত আছে এক দিন এক জন পথশ্রান্ত ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রের আলয়ে আতিথ্য স্বীকার করিতে আসিয়াছিলেন। অতিথিকে পাইয়া মিশ্র ঠাকুর যথাসাধ্য আহারের আয়োজন করিয়া দিলেন; ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ সমস্ত রন্ধন করিয়া আহারের পূর্ব্বে চক্ষু মুদিত করিয়া আরাধ্য দেবতাকে নিবেদন করিতে-ছেন, চৈতন্য নিঃশব্দে তথায় আসিয়া সমস্ত দ্রব্যাদি খাইয়া ফেলিলেন। কথিত আছে চৈতন্য তিনবার এই রূপে অতি-

থির আহার নষ্ট করিয়াছিলেন। জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের অন্যায় আচরণে ও অতিথির অবমাননায় ক্রোধান্ধ হইয়া চৈতন্যকে যথোচিত শাস্তি দিবার জন্য তাঁহার পশ্চাদ্ধাবমান হইলেন। চৈতন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আঁস্তাকুঁড়ে উচ্ছিষ্ট হাঁড়ির মধ্যে গিয়া বসিয়া রহিলেন। শচীদেবীও পুত্রের অত্যাচার শুনিয়া আঁস্তাকুঁড়ে উপস্থিত; নিকটে গিয়া মারিতে পারেন না; কেবল গালাগালি দিয়া বলিলেন এখনই গঙ্গাস্নান করিয়া আইস নতুবা বাটী হইতে দূর করিয়া দিব, চৈতন্য বলিলেন না! এ জগতে তো সকলই পবিত্র, কিছুই তো অস্পৃশ্য বা ঘৃণার্হ নহে। শচীদেবী আর কোন কথা বলিলেন না। মহাপুরুষদিগের মহত্ত্ব শৈশবকাল হইতে স্বতঃই স্ফুরিত হইতে থাকে; উত্তরকালে যিনি যে পথে চলিবেন তাহা শৈশব কালের অবলম্বিত পথ হইতেই অনেকটা বুঝিতে পারা যায়।

হরি নামের প্রতি চৈতন্যের আন্তরিক ভক্তি ও ভয় প্রকৃতিগত ছিল, শৈশব কাল হইতেই তিনি ঐ নামে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। যে সকল রমণীগণ মুক্তকণ্ঠে হরি সংকীর্ত্তন করিতে জানিত তিনি সর্ব্বদাই তাহাদের নিকট থাকিতেন এবং তাহাদিগকে এত ভাল বাসিতেন যে অন্য স্ত্রীলোকদিগের নিকট হইতে খাদ্য দ্রব্যাদি ভিক্ষা করিয়া কখন বা কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে দিতেন। নদীতে স্নান করিতে গিয়া রমণীগণের

নৈবিদ্য ভক্ষণ করিতেন এবং পূজার দ্রব্যাদি দূরে নিক্ষেপ করিতেন; কখন বা তাহাদেব ফুল চন্দনাদিতে নিজে সাজিয়া বলিতেন দেব পূজা করিলে কি হইবে আমাকে পূজা কর তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। যে সকল রমণীগণ তাঁহাকে ফুল ও খাদ্য দ্রব্যাদি দিত তিনি তাহাদিগকে "তোমাদের উত্তম স্বামী ও সাত ছেলে হইবে বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। যাহারা তাঁহাকে কিছুই দিত না তিনি তাহাদিগকে বলিতেন "তোমাদের সতিন হইবে পুত্রাদি কিছুই হইবে না।

চৈতন্যের পিতা মাতা বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন বলিয়া তাঁহাদেব গৃহে নানা দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল; যথা নিয়মে প্রত্যহই তাঁহাদের পূজা হইত। চৈতন্যদেব দেবীব প্রতিমূর্ত্তি সকল বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ং তাহাদের আসনে বসিয়া করতালি দিয়া হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতেন। এই সকল কারণে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে অতি বালককাল হইতেই দেব দেবীর প্রতি তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস ছিল না। স্বর্গের পবিত্র আলোকে তাঁহার হৃদয়েব কুসংস্কারান্ধকার দূরীভূত হইয়াছিল শৈশবকাল হইতেই স্বর্গীয় ভাব তাঁহার হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে স্থান পাইয়াছিল।

তাঁহার অত্যাচার ও নির্ভীকতার বিষয়ে আর একটী গল্প আছে। এক দিন তিনি খেলা করিতে করিতে প্রাঙ্গনে একটী সর্প দেখিয়া নির্ভয়ে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন; সর্প মনুষ্য

গাত্রস্পর্শে কুণ্ডলী করিয়া রহিল, চৈতন্য তদুপরি শয়ন করিলেন। এরূপ ব্যাপারে বাটীর সকলেই ব্যাকুল হইয়া সর্পভুক্ গরুড়কে আহ্বান করিতে লাগিল, সর্প সঙ্কুচিত হইয়া প্রাঙ্গন অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। এইরূপে চৈতন্যের বাল্যলীলা শেষ হইতে লাগিল।

যে সকল প্রাচীন কবিগণ চৈতন্যের জীবনী লিখিয়া গিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী বিশেষতঃ প্রাচীন লেখকগণের সহিত ধর্ম্মের একপ্রকার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ ছিল; এই প্রকার নানা কারণে চৈতন্যের জীবনের ঘটনার কোন কোন স্থানে অতি রঞ্জিত কোনটী বা কবির কল্পনায় সত্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। চৈতন্যের সর্প শয্যা উল্লেখ করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনচরিত লেখকগণ তাঁহাকে অনন্তশয্যাশায়ী বিষ্ণুর অবতার প্রমাণ করিয়াছেন। বিষ্ণুর অবতার প্রমাণোদ্দেশে এই ঘটনার অবতারণা হইয়াছে কি না তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। চৈতন্যের জীবনের ঘটনা বিশেষ আশ্রয় করিয়া তৎকালিন অধিকাংশ সামাজিক রীতি নীতির উদ্ধার হইতে পারে। প্রাণীমাত্রেই বিপন্ন হইলে বিপদ নিবারিণী শক্তির শরণাগত হয়; সর্পভুক্ গরুড়ের আহ্বানে সর্প পলায়ন করিল ইহা তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। আজ পর্য্যন্তও সর্প দেখিলে আমাদের দেশের প্রাচীনেরা হাতেতালি দিয়া ঘন ঘন গরুড়ের নামোচ্চারণ করিয়া থাকেন। দেব সহায় সর্প, হিংসা করাও

যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া তৎকালিন লোকের মনে বিশ্বাস ছিল তাহার কোন সন্দেহ নাই।

চৈতন্য বাল্যলীলা শেষ করিয়া বিদ্যাশিক্ষার উপযুক্ত বয়সে উপস্থিত হইলেন। আজকালকার মত সে সময়ে গ্রামে গ্রামে পাঠশালা ছিল না। অধ্যাপকও তখন সুলভ ছিল না, কাজেই তৎকালিন বালকদিগের যথোচিত শিক্ষাবিধান হইত না; সে সময়ে দশ বার খানি গ্রামের বালকের জন্য একটী মাত্র টোল ছিল; শিক্ষার্থী মাত্রকেই সেই টোলে পড়িতে হইত। তবে নবদ্বীপ অতি প্রাচীনকাল হইতে শাস্ত্রালোচনার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ; এজন্য তথায় বালকদিগের এক প্রকার শুধু শাস্ত্রশিক্ষা হইত। মুসলমান রাজাদিগের অত্যাচারে ও প্রতাপে প্রকাশ্যরূপে শাস্ত্রালোচনা বা শিক্ষাবিধানের অনেক বিপত্তি ছিল। জগন্নাথ মিশ্র চৈতন্যকে প্রথমে ব্যাকরণ শিক্ষার জন্য গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট পাঠাইলেন। মানসিক শক্তি-প্রভাবে চৈতন্য অতি অল্পকাল মধ্যেই ব্যাকরণে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিলেন। যাঁহারা তাঁহার পূর্ব্বে ব্যাকরণ শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া গেলেন। হাতে খড়ি দিবার এবং শুভদিনে সন্তানকে প্রথমে বিদ্যালয়ে পাঠাইবার নিয়ম তখন সমাজে বিশেষরূপ প্রচলিত ছিল। সে সময়ে মাটীতে অক্ষর খোদিত করিয়া অক্ষর পরিচয় ও বানানাদি শিক্ষা করিতে হইত। লেখা ও

পড়া এক সঙ্গেই আরম্ভ হইত; বানান শিক্ষা হইলে ব্যাকরণ পড়িতে ও বুঝিতে হইত। সে সময়ে গ্রন্থাদি দুষ্প্রাপ্য ছিল বলিয়া হাতে লিখিয়া পড়িতে হইত; কাজেই অক্ষর-পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই হাতে লিখিতে শিক্ষা করা প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই প্রধান কার্য্য ছিল। তৎকালীন লোকের বিশ্বাস অতি চমৎকার ছিল, লেখা পড়া শিখিলে কাহারও ছেলে হয়তো বাঁচিত না, কাহার ছেলে বা সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া নিরুদ্দেশ হইত। একপ বিশ্বাসের কোন যুক্তি মূলক কারণ নাই; কেবল চৈতন্যের অগ্রজ বিশ্বরূপের জীবনে ইহার একমাত্র প্রমাণ পাওয়া যায়।

দেখিতে দেখিতে চৈতন্য যৌবনশ্রী ধারণ করিলেন, অনিন্দিত সৌন্দর্য্যের উপর যৌবনসুলভ স্ফূর্ত্তি ও ভাবের বিকাশে তিনি লোকের প্রিয়তর হইয়া উঠিলেন। জ্ঞানজনিত গাম্ভীর্য্য তাঁহার মনোহর আকৃতিতে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে লাগিল; লোকে তাঁহার সুন্দর মূর্ত্তির দিকে অনিমেষ নয়নে না চাহিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিত না। যখন তিনি পথে বেড়াইতেন সকলেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রয়াস পাইত; তিনি তৎকালিন লোকের এক প্রকার নয়ন রঞ্জনের হেতুভূত হইয়াছিলেন। বিদ্যানুশীলনে সর্ব্বদা তাঁহার মন নিবিষ্ট থাকায় বাল্যকালের চপলতা লুপ্তপ্রায় হইয়া ছিল; কেন না জ্ঞানেতেই মানব হৃদয়ের স্থিরতা জন্মে ও সঞ্চিত ভাব প্রকাশিত

হইয়া থাকে। এইরূপে ভাবী ধর্ম্ম শিক্ষকের চরিত্র গঠিত হইতে লাগিল। চৈতন্যের সৌভাগ্যসূর্য্য পূর্ব্বাকাশে উকি দিতে ছিল এমন সময়ে তাঁহার অগ্রজ বিশ্বরূপ নিরুদ্দেশ হইলেন। বিশ্বরূপ শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সংসারে উদাসীন ছিলেন, তিনি সর্ব্বদাই শাস্ত্রানুলোচনায় ও হরিনাম কীর্ত্তনে দিন কাটাইতেন। সংসারের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্রও অনুরাগ ছিল না; পাপের অত্যাচার, ধর্ম্মের অনাদর, সংসারের দারিদ্র্যতা ও স্বার্থপরতার দৃশ্যে তাঁহার হৃদয় বিলোড়িত হইয়াছিল। ধর্ম্মহীন সংসারের পেতি তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন; সংসার ত্যাগই তাঁহার একমাত্র সঙ্কল্প ও শান্তির উপায় স্থির হইল। এই সময়ে তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত হয়; সংসার-বিরক্তজনের নিকট পরিণয়পাশ সুখের নহে, এই সকল কারণে তিনি তৎকালীন উপস্থিত শঙ্করারণ্য সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া গোপনে নিরুদ্দেশ হইলেন। কেহই জানিতে পারিল না বিশ্বরূপ কি উদ্দেশে কোথায় চলিয়া গেল। অনেক অনুসন্ধানে প্রকাশ হইল যে তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া শঙ্করারণ্য নামক একজন ব্রহ্মচারীর সহিত তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। পিতা মাতা শোকবিহ্বল হইয়া করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন; পূর্ব্ববিস্মৃত অপত্যশোকে আবার তাঁহাদের হৃদয়ে নূতন ভাব ধারণ করিল; এক মাত্র চৈতন্যই এখন তাঁহাদের বার্দ্ধক্যের আশ্রয় ও সান্ত্বনার আধার। চৈতন্যও

বিশ্বরূপের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন, ভ্রাতৃবিরহে তিনিও শোক-সন্তপ্ত হইলেন, কিন্তু তিনিই এখন পিতা মাতার এক মাত্র আশ্রয় মনে করিয়া উভয়কে যথাসাধ্য সান্ত্বনা ও সেবা করিতে লাগিলেন। চৈতন্যের বুদ্ধি যেরূপ ছিল দুঃখ সহিষ্ণুতা ও তদপেক্ষা কম ছিল না। এই সময় হইতে চৈতন্য আর পিতা মাতার দৃষ্টির বহির্ভূত হইতেন না; সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া তাঁহাদের আদেশ পালন করিতেন। দুঃখে সহিষ্ণুতা, শোকে ধৈর্য্যাবলম্বন, ও ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভর যে চৈতন্যের প্রকৃতিগত এই সময়ে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সময়ে চৈতন্যের গভীর তত্ত্বজ্ঞানের কথা জনসমাজে প্রকাশিত হয়; তাঁহার পিতা অন্য লোকের মুখে স্বীয় পুত্রের প্রশংসাবাদ শ্রবণে নিতান্ত বিমর্ষ ও ভগ্ন-হৃদয় হইলেন। বিশ্বরূপও তত্ত্ব-জ্ঞানের উত্তেজনায় সংসার ত্যাগ করিয়াছে, চৈতন্যও সংসার ত্যাগ করিবে এই চিন্তায় পিতা মাতা ব্যাকুল হইলেন। সংসা-রের একমাত্র আশ্রয় চৈতন্য গৃহে থাকিবে না ইহা পিতা মাতার প্রাণে সহিল না; উভয়ে চৈতন্যকে ডাকাইয়া বলি-লেন দেখ নিমাই! তুমি আর পড়িতে যাইও না; বাটী থাকিয়া যাহা চাহিবে তাহাই তোমাকে দিব, তোমার কোন অভাব ভোগ করিতে হইবে না। চৈতন্য পিতা মাতার অনু-রোধে নিতান্ত দুঃখিত মনে বাটীতেই বসিয়া রহিলেন। অন-বরত লেখা পড়ায় মন নিবিষ্ট থাকায় তাঁহার চঞ্চল ভাব সংযত

ছিল; এক্ষণে আবার তিনি পূর্ব্বভাব ধারণ করিলেন; সকলেই তাঁহার দৌরাত্ম্যে অস্থির হইয়া উঠিল; চারিদিক হইতে তাঁহার নামে অভিযোগ আসিতে লাগিল।

বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের কিছুদিন পরেই চৈতন্যের পিতৃবিয়োগ হইল। পতিবিয়োগে শচীদেবী হাহাকার করিতে লাগিলেন; একমাত্র চৈতন্যই কেবল তাঁহার সান্ত্বনার স্থল হইল; শোকে ও দারিদ্র্যতায় শচীদেবী অভিভূত হইলেন। গৃহে আহারের সংস্থান নাই; পুত্রও উপার্জ্জনক্ষম নহে, আত্মীয় নাই, আশ্রয় নাই প্রভৃতি চিন্তায় শচীদেবী ব্যাকুল হইলেন কিন্তু চৈতন্য অভিভূত হইলেন না। তাঁহার হৃদয়ে অমিত বল ছিল, ঈশ্বরে নির্ভর অবিচলিত ছিল, জ্ঞানে হৃদয় অটল ছিল তাইতে এরূপ দুঃসময়েও তিনি কর্ত্তব্যচ্যুত হইলেন না। পিতৃবিয়োগে কেবল মাত্র বৈরাগ্যের ছায়া দেখিতে পাইলেন। তিনি যথাবিধি স্বর্গীয় পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মনোযোগের সহিত গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে তিনি মাতাকে মহার্থপূর্ণ প্রবোধ বাক্যে বুঝাইতেন এবং বলিতেন আমরা এখনও নিঃসহায় হই নাই; দীনবন্ধু আমাদের সহায় আছেন; বিপদে তাঁহাতে নির্ভর করিলে বিপত্তির দিন নিরাপদে কাটাইতে পারিব। এইরূপ চৈতন্যের জীবনের দুঃসময় কাটিয়া গেল, সকল দুঃখই বিস্মৃতির গর্ভে অদৃশ্য হইল; কেবল সহিষ্ণুতা ও

নির্ভীকতা বাড়িল। চৈতন্যের জীবনের আর একটী সমস্যা উপস্থিত হইল; চিরজীবন অবিবাহিত থাকিয়া সংসারে যথেচ্ছাক্রমে বিচরণ করিবেন, না মাতৃ অনুরোধে বিবাহ করিয়া সংসারে আবদ্ধ হইবেন। ঐ সমস্যা চিন্তায় অনেক দিন কাটিয়া গেল, অনেক চিন্তার পর বিবাহ করাই স্থির হইল। মাতৃ অনুরোধ পালন ভিন্ন তাঁহার বিবাহ করিবার যে অন্য কোন কারণ ছিল তাহা বোধ হয় না; শাস্ত্রানুমোদিত গার্হস্থ্যধর্ম্ম তিনি পালন করেন নাই বা করিবার ও ইচ্ছা ছিল না। শচী দেবীও চৈতন্যকে বিবাহ দিয়া সংসারে আবদ্ধ করিবেন এই চিন্তাতেই ছিলেন; তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে চৈতন্য উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী পাইলে কখন নিরুদ্দেশ হইবে না। প্রকৃত পক্ষে সংসার ত্যাগের কল্পনা এক মুহূর্ত্তের জন্য তখন তাঁহার হৃদয়ে অধিকার করে নাই। কেবল মানসিক স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্যই তিনি বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন।

একদিন চৈতন্য স্নান করিবার জন্য ঘাটে গিয়া রমণীগণের পূজার দ্রব্যাদি কাড়িয়া লইতেছেন, কাহারও নৈবিদ্য ভক্ষণ করিতেছেন, কাহারও গায়ে জল দিয়া ধ্যান ভঙ্গ করিতেছেন; সকলই তাঁহার অত্যাচারে অস্থির ও পলায়নপর, কেহবা স্বেচ্ছায় তাঁহাকে খাবার দ্রব্যাদি দিতেছে, কাহারও বা তিনি বলপূর্ব্বক খাবার দ্রব্য কাড়িয়া লইতেছেন, তাহার মধ্যে একটী কুমারী ভীতা হইয়া অবনতশিরে পুষ্প চন্দনাদি তাঁহার চরণে

অর্পণ করিলেন ; চৈতন্য এইরূপ ব্যবহারে প্রীত হইয়া কুমারীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মী ; লক্ষ্মীকে দেখিবামাত্রই তিনি সৌন্দর্য্যে অনুরক্ত হইলেন, ক্রমে ক্রমে এই অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, শচীদেবীও চৈতন্যের সহচরদিগের মুখে একথা শুনিতে পাইলেন। সকল গুণেই লক্ষ্মী চৈতন্যের সহধর্ম্মিণী হইবার উপযুক্ত পাত্রী ছিলেন, বিশেষতঃ বল্লভাচার্য্যও কুলে মানে নবদ্বীপের মধ্যে এক জন প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। শচীদেবীর মতানুসারে বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইল ; শুভদিনে পবিত্র অনুরাগে চৈতন্য লক্ষ্মীর পাণিগ্রহণ করিলেন। শচীদেবীর অনেক দিনের ভয় দূরীভূত হইল ; নিমাই আর সন্ন্যাসী হইবে না ইহা তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল। বিবাহ করিয়া চৈতন্য একটী চতুষ্পাঠী স্থাপন করিলেন ; নিজেই তাহার অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। চৈতন্যের পাণ্ডিত্যের বিষয় পূর্ব্বেই জনসমাজে প্রকাশিত হইয়াছিল ; এক্ষণে তিনি অধ্যাপক হইয়াছেন প্রচার হওয়ায় চতুর্দ্দিক হইতে অসংখ্য শিষ্য তাঁহার নিকট অধ্যয়নার্থ আসিতে লাগিল। তিনিও বিশেষ দক্ষতা ও কৃতকার্য্যতার সহিত শিক্ষা বিধান করিতে লাগিলেন। অধ্যাপনা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি একজন অদ্বিতীয় তার্কিক ও দার্শনিক হইলেন। সে সময়ে পণ্ডিতদিগের দিগ্বিজয় প্রথা প্রচলিত ছিল ; চৈতন্য একজন প্রসিদ্ধ তার্কিক হইয়াছেন, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত-

গণের প্রভুত্বের প্রতিদ্বন্দীর অবতারণা হইল। কাজেই চতুর্দ্দিক হইতে দিগ্বিজয় খ্যাতি লোলুপ পণ্ডিতগণ শাস্ত্রতর্কে চৈতন্যকে পরাস্ত করিবার জন্য নবদ্বীপে উপস্থিত হইতে লাগিলেন; কিন্তু কেহই অজেয় রহিলেন না। সকল প্রকার তর্কেই তিনি অগ্রগামী হইতেন; সময়ে সময়ে এরূপ প্রশ্ন করিতেন যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক তাহার অর্থ কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। গঙ্গার ঘাটে স্নানার্থী অধ্যাপকগণের সহিত সর্ব্বদাই তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন; কোন তর্ক পরস্পরে গালাগালি হইলে মীমাংসা হইত। পণ্ডিতগণ স্বমতের বিরুদ্ধ বাদীর প্রতি ক্রোধান্ধ হইয়া তর্কের ও জ্ঞানের সূত্র হারাইতেন। চৈতন্য সেরূপ ছিলেন না; তিনি তর্কে সকলের অহঙ্কার চূর্ণ করিতেন বটে কিন্তু কখনও তর্ক করিতে করিতে ক্রোধে হতবুদ্ধি হইতেন না। তিনি যাহাকে যেদিন ধরিতেন তাহার আর রক্ষা থাকিত না। চৈতন্য সকল সময়ে গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারিতেন না; সমবয়স্কদিগের সঙ্গে সময়ে সময়ে আমোদ প্রমোদ করিতেন। নিমাই পণ্ডিত হইয়াছে মনে করিয়া অনেক বাল্যসহচর তাঁহার সহিত মিশিতেন না কিন্তু চৈতন্য সেরূপ ভাবের লোক ছিলেন না; সকলের সঙ্গেই সমান ভাব রক্ষা করিয়া চলিতেন। এই সময়ে তাঁহার চপলতা আবার বৃদ্ধি হয়; যদিও বাল্যকালের ন্যায় অন্যের প্রতি অত্যাচার করিতেন না বটে কিন্তু সহজে লোককে চটাইতে বড় ভাল বাসিতেন। চট্টগ্রাম

ও শ্রীহট্টবাসী দিগকে "বাঙ্গাল" বলিয়া বা তাহাদের কথা লইয়া উপহাস করিতেন; কিন্তু নিজে যে শ্রীহট্ট বাসীর সন্তান তাহা মনে করিতেন না।

চৈতন্যের নাম ক্রমে ক্রমে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইল। এই সময়ে তিনি সশিষ্যে পূর্ব্বাঞ্চলে গমন করিয়া শ্রীহট্ট চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন। এরূপ কথিত আছে যে তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া পূর্ব্বাঞ্চলে পদ্মাবতী (পদ্মা) নদীতীরে অনেক দিন বাস করেন। চৈতন্য কোথায় কোথায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে ইহা নিশ্চিত যে তিনি নৌকাপথে পূর্ব্বাঞ্চলে ভ্রমণ করিয়াছিলেন; কাজেই নদীতীরবর্ত্তী স্থান সকলই দেখিয়াছিলেন। চৈতন্য পূর্ব্বদেশে আসিয়াছেন, সকলেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য উপহার লইয়া তাঁহার অবস্থিতি স্থানে উপস্থিত হইল। যাহারা তাঁহাকে দেখিতে আসিল তাহারাই চৈতন্যের শিষ্য হইল। চৈতন্য এইরূপে পূর্ব্বাঞ্চল ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। পূর্ব্বাঞ্চল ভ্রমণ সময়ে তাঁহার পত্নী বিয়োগ হয়। কেহ বলেন চৈতন্যের বিরহ অসহ্য হওয়ায় তদীয় পত্নী জীবলীলা সম্বরণ করেন; কেহবা সর্প দংশনই তাঁহার মৃত্যুর কারণ বলিয়া থাকেন; শেষোক্ত কারণই সত্য। পত্নী বিয়োগে চৈতন্যের মানসিক অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই; বিশেষতঃ লোকে কিছু মনে করিবে ভাবিয়া পূর্ব্বা-

পেক্ষা ধর্ম্মানুলোচনায় বিশেষ মনোযোগী হইলেন। পূর্ব্বাঞ্চল হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি সর্ব্বদাই মুকুন্দ সঞ্জয়ের বাটীতে শিষ্যগণের অধ্যাপনা কার্য্যে অনুরক্ত থাকিতেন। প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর বেলা পর্য্যন্ত ও স্নান আহারের পর হইতে অর্দ্ধেক রাত্রি পর্য্যন্ত শিষ্যগণের সহিত ধর্ম্মালাপ করিতেন। সর্ব্বদাই তাঁহার মনে ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কোন না কোন চিন্তা জাগরূক থাকিত, কাজেই অন্য চিন্তা স্থান পাইত না।

শচীদেবী পুত্রকে পুনর্ব্বার বিবাহ দিবার জন্য উপযুক্ত কন্যা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর নবদ্বীপ-বাসী ধর্ম্মভীরু সনাতন রাজপণ্ডিতের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত চৈতন্যের বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিয়া পণ্ডিত কাশীনাথ মিশ্র-বরকে ঘটক নিযুক্ত করিলেন। সনাতনরাজ পণ্ডিতেরও পূর্ব্বাবধি চৈতন্যের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিবার ইচ্ছা ছিল, কাজেই অল্প দিনে ও সহজে সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইল। শুভদিনে মহা সমারোহে চৈতন্য বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করিলেন। এক দিন জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে, চৈতন্য ভাগীরথীতীরে শিষ্যগণের সহিত ধর্ম্মালাপ করিতেছেন এমন সময়ে দিগ্বিজয়ী নামা জনৈক পণ্ডিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। চৈতন্যের সহিত তর্ক করাই তাঁহার গুপ্ত উদ্দেশ্য; চৈতন্য ব্যাকরণে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত জন্য দিগ্বিজয়ী ব্যাকরণের কূট তর্ক লইয়া বিচার আরম্ভ করিলেন। চৈতন্য দিগ্বিজয়ীকে গঙ্গার মহিমা

কীর্ত্তন করিতে বলিলে তিনি শত শ্লোক রচনা পূর্ব্বক পাঠ করিলেন। চৈতন্য সেই রচিত শ্লোকের মধ্যে ব্যাকরণ দোষ দেখাইয়া তর্কে প্রবৃত্ত হইলেন। দিগ্বিজয়ী তর্ক করা দূরে থাকুক চৈতন্যের প্রশ্নের মর্ম্মার্থ বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না; এইরূপে অভিমানী পণ্ডিত চৈতন্যের নিকট পরাস্ত হইলেন কিন্তু চৈতন্য অমায়িক স্বভাবের লোক ছিলেন; দিগ্বিজয়ী পরাস্ত হইলেও তাঁহার যথোচিত সম্মানের কোন ত্রুটি হয় নাই। প্রবাদ আছে যে একদিন গঙ্গা পার হইবার সময় নৌকার উপরে তাঁহার সহিত একজন ব্রাহ্মণের পরিচয় হইল; চৈতন্যের হাতে একখানি পুঁথি ছিল; ব্রাহ্মণ পুঁথিখানির নাম জিজ্ঞাসা করিলে চৈতন্য বলিলেন এ পুঁথিখানি আমার রচিত ন্যায় শাস্ত্রের টীকা; ব্রাহ্মণ আর কোন কথা না বলিয়া বিষণ্ণভাবে রহিলেন। চৈতন্য এরূপ ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; ব্রাহ্মণ বলিলেন আমি একখানি ন্যায় শাস্ত্রের টিকা রচনা করিয়াছি, কিন্তু আপনার রচিত টিকা থাকিতে আমার টিকার কোন আদরের সম্ভাবনা নাই। চৈতন্য দেব ইহা শুনিয়া স্বীয় পুস্তকখানি গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিলেন। চৈতন্যের এরূপ মহত্ব দেখিয়া ব্রাহ্মণ অবাক্ হইয়া রহিলেন; ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহার এইরূপ ব্যবহারে নিতান্ত প্রীত হইলেন এবং তাঁহার অজস্র প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এইরূপ স্বার্থত্যাগের প্রবাদ অনেক শুনিতে পাওয়া যায় কিন্তু তৎসমুদয়ের কোন ঐতিহাসিক সূত্র

পাওয়া যায় না। এই ঘটনাটি চৈতন্যের হৃদয়ের কত গভীর ভাব প্রকাশ করিতেছে; ইহা ত্যাগ স্বীকারের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত; অন্যের দুঃখ দেখিলে তাঁহার হৃদয় স্বভাবতঃ দয়ার্দ্র হইত এবং তিনি প্রাণপণে দুঃখ নিবারণে চেষ্টা করিতেন, অন্যের সুখ, সমৃদ্ধির জন্য তিনি নিজের স্বার্থ বিপন্ন করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হইতেন না; তিনি মনে করিতেন যে তাঁহার নিজের জীবন অন্যের উপকারের জন্যই এজগতে প্রেরিত হইয়াছে; পরোপকারই তাঁহার জীবনের ব্রত; ত্যাগ স্বীকারই তাঁহার জীবনের একমাত্র অনুষ্ঠান।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ধর্ম্ম-জীবন।

চৈতন্যের জীবনের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইল। এ পর্য্যন্ত তিনি অধ্যয়ন অধ্যাপনা ও তর্ক বিতর্কে দিন কাটাইয়াছেন; এখন আর তাঁহার এ সকল ভাল লাগিল না। শুষ্ক জ্ঞান ও নীরস শাস্ত্রীয় তর্কে তাঁহার বিরক্তি জন্মিল; অন্তরাত্মা যাহা চায় তাহা তাঁহার নাই জন্য তিনি অভাবে পড়িলেন। এত দিন বৃথা গিয়াছে এই চিন্তা ও অনুতাপের দংশনে তাঁহার

মন অস্থির হইল। কি করিয়াছেন ও কি করিবেন এই দুই চিন্তার সংঘর্ষণে অনিবার্য্য চিন্তার উৎপত্তি হইল। এত দিন বহির্বিষয়কে সর্ব্বস্ব মনে করিয়া সংসারে মহা আনন্দে বেড়াইতেছিলেন, আত্মজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া পার্থিব ঐশ্বর্য্য বহুমূল্য জ্ঞানে দিন কাটাইতেছিলেন; সহসা ভাবের বৈপরীত্য উপস্থিত হইয়া এক অভিনব জীবনের সূত্রপাত হইল।

এই সময়ে এক দিন তাঁহার সঙ্গে শ্রীবাসের দেখা হয়; শ্রীবাস, মুকুন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ তখন ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন জন্য নবদ্বীপেই বাস করিতেন, তাঁহারা অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া প্রত্যহই অদ্বৈতের সভায় ধর্ম্মালাপ ও হরিসংকীর্ত্তনাদি করিতেন। শ্রীবাসের সঙ্গে দেখা হইলে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কূট-তর্ক উঠিল কিন্তু কিছুরই চূড়ান্ত মীমাংসা হইল না; বিশেষতঃ অদ্বিতীয় তার্কিক নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে তর্কে কাহারও জয়ী হইবার আশা ছিল না। শ্রীবাসের মুখে চৈতন্য প্রথমে ভক্তির কথা শুনিলেন; ভক্তি কি, কেমন করিয়া উহা লাভ করিতে হয়, ভক্তির চরম অবস্থা কি, প্রভৃতি কতিপয় সূক্ষ্ম প্রশ্নে তাঁহার মন আলোড়িত হইয়া উঠিল; তিনি অকপট চিত্তে শ্রীবাসকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীবাস বলিলেন যাহা লাভ করিলে দীনবন্ধুর নাম শ্রবণে ও কীর্ত্তনে লোকের হৃদয় বিগলিত হয়, পাপের উত্তেজনা হইতে লোকে মুক্তি পায় তাহাই ভক্তি। ভক্তি ধর্ম্মের জীবন, ভক্তি প্রাণীর শান্তি,

ভক্তি পাপীর গতি। এভক্তি সাধনা ভিন্ন শুষ্কজ্ঞানে লাভ হয় না; বিষয়াসক্তি, অহঙ্কার, মান ও অধীরতায় ইহা পাওয়া যায় না, অন্তরের প্রকৃত অভাবে চীৎকার করিতে হইবে, গভীর য'ত-নীয় মনোবেদনা জানাইতে হইবে তাহা হইলে প্রকৃত সাধনা কি জানিতে পারিবে। তুমি সর্ব্বদা বিদ্যার অহঙ্কার করিয়া থাক; বিদ্বানের অহঙ্কার মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নহে; তুমি কি শিখিয়াছ আর কি শিখিবার আছে তাহাই একবার ভাবিয়া দেখ; যতই জানিবে ততই কিছু জানিনা বলিয়া বিশ্বাস করিবে, এই জন্যই প্রাচীন পণ্ডিতগণ মুক্তকণ্ঠে বলিয়া-ছেন যে:—

"নমন্তি ফলিনো বৃক্ষাঃ।'
নমন্তি গুণিনো জনাঃ॥"

তুমি যতদিন সেই জ্ঞানের চরম বিষয় পরমাত্মাকে না জানিতে পারিবে ততদিন তোমার জ্ঞান বৃথা সঞ্চিত হইয়াছে জানিবে। এই সকল কথা বলিয়া শ্রীবাস গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। শ্রীবাসের কথায় চৈতন্য নিজের অভাব বুঝিতে পারিলেন। সংসারের ভালবাসায় অন্ধ হইয়া তিনি যে সংকীর্ণ-হৃদয় হইয়াছেন, এভাব টুকু তাঁহার হৃদয়ে আঘাত করিল; সেই দিন হইতেই তাঁহার হৃদয়ে ক্ষত রহিয়া গেল। জগতকে ভাল না বাসিলে, সমান চক্ষে না দেখিলে জীবন উন্নত হইতে পারে না ইহা তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল। ধর্ম্ম-জগতে

স্থষ্টবস্তুর পার্থক্য নাই, ধর্ম্মের চক্ষে সকলই সমান এই বিশ্বজনীন ভালবাসার কথা বুঝিলেন। অভাব বুঝিলে প্রতীকারের চেষ্টা হয়, চেষ্টা হইলেই অভাব নিবারিত হয়। চৈতন্যের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, তাঁহার ধর্ম্ম জীবনের গতি নির্দ্দিষ্ট হইল। যাঁহার নাম আজও শত শত নর নারীর আদরের ধন, আরাধ্যের ও আরাধ্য; যিনি সমগ্র বঙ্গদেশকে স্বীয় ভক্তিগানে মুগ্ধ করিয়াছিলেন; তাঁহার হৃদয় আজ জীবনের উদ্দেশ্য নির্ণয়ে অস্থির; তিনি আজ অভাবে পড়িয়া কি যেন খুঁজিতেছেন কিন্তু পাইতেছেন না। যাঁহার মূর্ত্তি দেখিলে দর্শক মাত্রেই আনন্দিত হইত; আজ তিনি মলিন, চিন্তিত ও বিষণ্ণ; তাঁহার হৃদয়ের অমিত বল যেন কে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। তিনি অনন্ত জগতের যে দিকে তাকাইতেছেন সেই দিক হইতেই তাঁহার হৃদয়ে নূতন নূতন অভাব জাগিয়া উঠিতেছে। যাঁহার *নাম ভবিষ্যদ্বংশীয় শত শত বঙ্গবাসীর সদগতির মূলমন্ত্র*; তিনি আজ নিজের গতি নির্ণয়ে ব্যাকুল। চৈতন্যের কিছুই ভাল লাগিল না; সংসার দুঃখময়, জীবন ভারাক্রান্ত মনে করিলেন। প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞানে, কঠোর তর্ক চর্চ্চায়, যাহা হয় নাই, হৃদয়ের প্রকৃত অভাব জ্ঞান তাহা সাধন করিল। আমি অনেক জানি মনে করিতেন বলিয়া চৈতন্য এতদিন কিছুই জানিতে পারেন নাই; আজ "আমি কিছুই জানি না" বুঝিয়াই প্রকৃত জ্ঞানের জ্যোতি দেখিতে পাইলেন;—বাস্তবিক এত দিনের

পর আজ চৈতন্যের চৈতন্য হইল! অন্তরাত্মা যে ধনের অভাবী আজ তিনি প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া তাহাই খুঁজিতেছেন; কিন্তু প্রকৃতির ভাণ্ডারে যেন সে ধন খুঁজিয়া পাইতেছেন না। হতাশে দৃষ্ট বস্তু তন্ন তন্ন করিতেছেন; তবুও অভিলষিত ধন মিলিতেছে না। এইরূপে অনেক দিন কাটিয়া গেল; অনেক দিনের চিন্তার পর স্থির হইল যে তীর্থভ্রমণই মনের শান্তিলাভের একমাত্র উপায়। তীর্থভ্রমণ ও স্বর্গীয় পিতার সদ্গতি করিবার উদ্দেশে চৈতন্য সশিষ্যে গয়াধামে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে পীড়িত হওয়ায় তিনি অনেক বিলম্বে অভীষ্টস্থানে পৌঁছিলেন; গয়াতে যথা বিধানে তিনি পিতার স্বর্গীয় আত্মার সৎকার্য্য করিলেন; তদনন্তর বিষ্ণুপাদ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণের ঐকান্তিক ভক্তি, বাহ্য জ্ঞানশূন্য ধ্যান, গভীর ভাবোদ্দীপক বন্দনা শুনিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল, হৃদয়ে বিমল ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখা দিল। শুষ্কজ্ঞান প্রেমে অন্ধ হইয়া গেল; হৃদয়ের সীমা অতিক্রম করিয়া ভক্তির তরঙ্গ প্রবাহিত হইল। যাঁহার সার্ব্বজনিক প্রেম ও ভক্তিতে বঙ্গবাসী মুগ্ধ; তাঁহার নিজের প্রেম ও ভক্তি এইরূপে প্রথম সঞ্চারিত হইল। চৈতন্যের মানসিক যন্ত্রনা আরও দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিল; তিনি কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া হতাশে কাঁদিতে লাগিলেন;

"ভক্তিতেই মুক্তি" এই মূলমন্ত্রের প্রথম বীজ রোপিত হইল।

বিষ্ণুপাদ মন্দিরে কুমার হট্ট (হালিসহর) নিবাসী ব্রহ্মচারী ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে চৈতন্যের পরিচয় হইল; ঈশ্বরপুরী একজন বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ও মাধবেন্দ্র পুরীর প্রিয় শিষ্য। মাধবেন্দ্রপুরী অদ্বৈত প্রমুখ বৈষ্ণবগণের অনেক পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়া ভক্তির পথ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন; এখন এই পথে চৈতন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গয়াতে প্রাচীন ভক্তগণের ঐকান্তিক ভক্তি ও একাগ্রতা দেখিয়া চৈতন্যের ভক্তিস্রোত দিন দিন প্রবলতর হইতে লাগিল; এই স্রোত পরিশেষে বহিতে বহিতে বঙ্গদেশ ভাসাইয়া সাগরে মিশিয়াছিল। ঈশ্বরপুরীর উদার ব্যবহারে চৈতন্য এত প্রীত হইলেন যে তিনি আর মনের হতাশ দমন করিতে না পারিয়া তাঁহার নিকট বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হই-বার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ঈশ্বরপুরীও চৈতন্যের হৃদয় জানিতে পারিয়া তাঁহাকে স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। এই-রূপে ধর্ম্মবীর দীক্ষিত হইলেন; পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার হৃদয়-ধর্ম্মের জন্য প্রস্তুত ছিল এক্ষণে উপযুক্ত আদর্শ পাইয়া পূর্ব্বভাব বিক-সিত হইল। চৈতন্য দীক্ষিত হইয়া এত প্রেমানুরক্ত হইয়া-ছিলেন যে সময়ে সময়ে আত্মবিস্মৃত হইয়া উন্মত্তপ্রায় হইতেন। দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরী তাঁহার মার্জ্জিত হৃদয়ে যে ভক্তিরস সঞ্চারিত করিয়া ছিলেন তাহা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। একদিন

প্রেমানুরাগে বিহ্বল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মথুরাভিমুখে গমন করিতেছিলেন পথিমধ্যে ভাবী সন্ন্যাসধর্ম্মের দৈববাণী শুনিয়া অগ্রসরণ হইতে নিরস্ত হইয়াছিলেন।

উত্তরকালে অকাতরে বঙ্গের ঘরে ঘরে প্রেম বিতরণ যাহার ব্রত ছিল তিনিও একদিন প্রেমের অভাব কল্পনায় সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। চৈতন্যের বাল্যকালের চপলতা দূরীভূত হইয়া গাম্ভীর্য্য বদ্ধ-মূল হইল; ঐশ্বরিক চিন্তা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। অনেক দিন স্বদেশ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন; জননী নিতান্ত দুরাবস্থায় আছেন মনে করিয়া চৈতন্য নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিলেন। দেশে আসিলে সকলেই তাঁহার ভাবান্তর দেখিয়া বিস্মিত হইলেন; তীর্থভ্রমণে ও ঈশ্বরপুরীর সহবাসে যে তাঁহার মনের মালিন্য বিলুপ্ত হইয়াছে তাহা অনেকে অনুমান করিলেন। চৈতন্য আর পূর্ব্বের ন্যায় অস্থির ও তর্ক প্রিয় নহেন; কাহারও প্রতি অত্যাচার করেন না সর্ব্বদাই একমনে প্রকৃতির দিকে তাকাইয়া চিন্তিত ও বিষাদিত থাকিতেন; মন যেন সর্ব্বদাই কোন গভীর তত্ত্বানুসন্ধানে অনুরক্ত। তাঁহার মুখশ্রী মলিন, সৌন্দর্য্য হ্রাস হইয়াছে; মনের স্ফূর্ত্তি, হৃদয়ের বল নিস্তেজ হইয়াছে। তিনি ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন বটে কিন্তু এ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম জনিত বিমলসুখ অনুভব করিতে পারেন নাই; প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের উত্তেজনায় অন্তরাত্মার পিপাসা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। দিবসের প্রারম্ভে পূর্ব্বাকাশে তরুণ তপন, মধ্যাহ্নে

জগতের কোলাহল, দিবাবসানে গোধুলি ও আশ্রয়োন্মুখ খেচর গণের দ্রুতগতি প্রভৃতি নিত্যদৃশ্য তাঁহাব নিকট নিত্য নূতন ভাবোদ্দীপক। প্রকৃতির কোলে বাতাস খেলা করে, পাতা নড়ে, ফুল ফুটিয়া সৌরভ বিকীর্ণ করিয়া পড়িয়া যায়—চৈতন্য এ সকল দৃশ্যে জগতের অস্থিরতা দিব্য চক্ষে দেখিতে পান। ভাবুকের দৃষ্টিপথে ভাবনার অনন্তশ্রেণী ভাসিয়া বেড়ায়; তিনি তাহা ভাবিতে ভাবিতে আত্মহারা হয়েন। ভাবনার কাছে কিছুই পুরাতন নহে; যত ভাবনা তত নূতন ভাব প্রকাশিত হয়; এই নিত্য নূতন ভাবে প্রেমের সৃষ্টি হয়, এই প্রেমে জগত আত্মীয়, জগত পাতা আত্মীয় হইতেও আত্মীয় হয়েন। প্রকৃতির মনোহর দৃশ্যে চৈতন্য প্রেমের তত্ত্ব বুঝিলেন। দিবার প্রারম্ভে ও অবসানে পাখী গান করে, বায়ু পাতার কানে কাণে কথা বলিয়া দৌড়িয়া যায়, নদী কুলকুলস্বরে সাগরে ছুটিয়া যায়,—এ সকল দৃশ্যে চৈতন্য ভক্তিব উত্তেজনায় অধীর হইলেন। তিনি বিংশতি বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন; মুখের শ্রী, দেহের বল, মনের স্ফূর্ত্তির সম্পূর্ণ বিকাশের এই উপযুক্ত সময় কিন্তু আভ্যন্তরিক চিন্তার প্রতাপে সকলই লুপ্ত ও মুদ্রিত। মন যাহা ভাবে, মুখেও তাহাই বলিতে লোকের স্বতঃই ইচ্ছা জন্মে। চৈতন্যও হৃদয়ের ভাব গোপন করিতে না পারিয়া সর্ব্বদাই অন্যান্য ভক্তগণের সহিত ধর্ম্মালাপে মত্ত হইলেন। ধর্ম্মালাপ করিতে করিতে ভক্তির উচ্ছ্বাস এত বৃদ্ধি হইল যে

তিনি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া হৃদয়ের গভীরতম কথা অকপটচিত্তে সকলের নিকট বলিতেন। ভূকম্পনে আগ্নেয় পর্ব্বতের গর্ভস্থ ধাতুরাশি যেরূপ প্রবাহ স্রোতে উদ্গীর্ণ হয়; সেইরূপ সাধুগণের সহিত ভক্তির আলাপে তাঁহার হৃদয়ের প্রেম স্বতঃই উচ্ছলিত হইত। চৈতন্য বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া বৈষ্ণবদল মহা আনন্দিত হইল; চৈতন্যও সমধর্ম্মাবলম্বী পাইয়া উৎসাহিত হইলেন এবং মনের কথা বৈষ্ণবদলের নিকট বলিতে লাগিলেন। শচীদেবী পূর্ব্ব হইতেই পুত্রের বৈরাগ্য ও ভক্তির কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন; পাছে চৈতন্য সন্ন্যাসী হয় এই আশঙ্কা আবার তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। চৈতন্য যে সময়ে সময়ে প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত, ভূলুণ্ঠিত ও উন্মত্তবৎ হইতেন তাহাও শচীদেবী জানিতেন। একদিন শচীদেবী ঔদাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে চৈতন্য বলিলেন মা! অসার সংসারে সর্ব্ব-শক্তিমান হরিভিন্ন মুক্তির উপায়ান্তর নাই; আমি আজ এত-কাল ধূলিখেলার পর সেই অনন্তশক্তিতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছি। ইহাতে শচীদেবী পুত্রের বৈরাগ্যভাব স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন; তিনি অনন্যোপায় হইয়া চৈতন্যের বৈরাগ্য চিন্তায় বিষন্ন হইলেন।

এদিকে চৈতন্য শিষ্যগণের নিকট অবলম্বিত ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব বিবৃত করিতে লাগিলেন, গ্রামের মধ্যে একথা প্রচার হইয়া গেল। একদিন শিষ্যগণ ধাতুর সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা করিলে চৈতন্য

বলিলেন হরির শক্তিই ধাতু; ধাতু হীন দেহ জীবন শূন্য হয়; জীবন শূন্য হইলে জাতীয় ধর্ম্মানুসারে কেহ দেহ দগ্ধ কেহ বা ভূমিতে প্রোথিত করে। হরির শক্তিই ধাতু; এই শক্তিই জীবন প্রবাহের আদিকারণ ও সকল জীবের আরাধ্য অতএব শিষ্যগণ তোমরা সকলে তন্ময়চিত্তে সেই শক্তির আরাধনায় তৎপর হও ও সেই শক্তিতে আত্ম সমর্পণ কর। এইরূপে চৈতন্যের ধর্ম্মভাব সকল কার্য্যেই প্রকাশিত হইতে লাগিল; তিনিও ধর্ম্মচিন্তায় অন্য চিন্তা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। সময়ে সময়ে তাঁহার ভক্তির আবেগ এত বৃদ্ধি হইত যে তিনি নির্ব্বাক হইয়া পাগলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার সংসারে আসক্তি নাই, স্বীয় রমণীতে দৃষ্টিপাত নাই, জীবনে মমতা নাই। দুর্ব্বোধ্য ধর্ম্মতত্ত্বালোচনায় বিরক্ত হইয়া শিষ্যগণের মধ্যে অনেকে অন্য অধ্যাপকের নিকট চলিয়া গেল; অনেকে চৈতন্যের পথের পথিক হইল। এতদিন পরে চৈতন্য প্রকাশ্যরূপে ধর্ম্মগুরু হইলেন। হৃদয় খুলিয়া মুক্তস্বরে চৈতন্য শিষ্যগণের সহিত সংকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। সংকীর্ত্তন করিতে করিতে তিনি কোন সময়ে ভূলুণ্ঠিত, কোন সময়ে মূর্চ্ছিত হইতেন যখন তাঁহার হৃদয় ভক্তিরসে সিক্ত হইত তখন তাঁহার আত্মবিস্মৃত ও অনুভূতি শূন্যতা প্রকাশ পাইত; এ সময়ে তাঁহার কাতরতা দেখিলে জড় হৃদয়েও ভক্তির সঞ্চার হইত। যিনি আমরণ জগতে ভক্তি বিতরণ, ত্যাগ স্বীকারের

জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন, সাম্য স্থাপন করেন এইরূপে তাঁহার ভক্তির উৎস প্রথম উন্মুক্ত, ত্যাগ স্বীকারের ইচ্ছা উদ্বেলিত এবং সাম্য স্থাপনের কল্পনা কার্য্যে পরিণত হয়। ধর্ম্মের দ্বার সকলের নিকটেই সমভাবে উদ্ঘাটিত; সকলেই স্ব স্ব অচলবিশ্বাসে মুক্তি পাইতে পারে ইহা তাঁহার অটল বিশ্বাস। যে নগর-সংকীর্ত্তনে আজও বঙ্গ দেশের অসংখ্য হৃদয় প্রেমে বিগলিত হয় সেই সংকীর্ত্তনের এই প্রথম সূত্রপাত হইল। পাপীর অনুতপ্ত হৃদয়ের ভ্রান্ত বিশ্বাস উন্মূলিত ও দুঃসহ যাতনা দূরীভূত করাই এ সংকীর্ত্তনের গূঢ় উদ্দেশ্য। চৈতন্যের হৃদয় অনন্ত প্রেমের আকর; সহিষ্ণুতা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তাঁহার স্বভাবের প্রধান উপকরণ; সেই জন্যই তিনি অসংখ্য শাক্তগণের মধ্যেও নিজের বিশ্বাস স্থির রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রভুত্ব সংস্থাপক বিষয়েরও তাঁহার অভাব ছিল না কিন্তু তিনি কখন ভ্রমেও সে প্রভুত্ব দেখাইতেন না। তাঁহার সংসারে বৈরাগ্য, সংকীর্ত্তনে মত্ততা, অধ্যাপনা কার্য্যে বিরক্তি দেখিয়া কেহবা সন্তুষ্ট কেহবা দুঃখিত হইলেন। খ্যাত নামা পণ্ডিতগণ স্ব স্ব পাণ্ডিত্য প্রতিদ্বন্দী হীন হইল ভাবিয়া আনন্দিত, শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া চৈতন্যের সংসারে অনাসক্তি দেখিয়া দুঃখিত ও নিরাশ হইলেন। বৈষ্ণব দল অদ্বিতীয় তত্ত্বজ্ঞানী চৈতন্যকে পাইয়া গর্ব্বিত ও আনন্দিত হইল। এইরূপে কেহবা স্বার্থ লাভে আনন্দিত কেহবা স্বার্থ বিপন্ন দেখিয়া দুঃখিত হইলেন।

এদিকে চৈতন্য কেবল মাত্র ভক্তি ও চিন্তাতে মত্ত; ভক্তিই জীবনের আধার, চিন্তাই জীবনের ব্রত এই বিশ্বাসে কি দিন কি রাত্রি সকল সময়েই তিনি বাহ্য জ্ঞান শূন্য। প্রেমিকের জীবন প্রেমে অন্ধ; প্রেমিকের চিন্তা যখন ঐশ্বরিক চিন্তায় নিযুক্ত হয়; বহির্জগৎ তখন তাহার হৃদয়ে স্থান পায় না: প্রেমিক ক্ষুদ্র হইয়াও অনন্তে মিশিয়া যায়, জলবুদ্বুদ হইলেও সাগরে ভাসিয়া নাচিয়া মিলাইয়া যায়। চৈতন্যেরও তদ্রূপ হইয়াছিল; তিনি ঐশিক বলে পুষ্ট ও চালিত; তাঁহার হৃদয় অনন্ত শক্তির আধার, তাঁহার বল অনন্ত-শক্তির প্রতিবিম্ব। একটী হৃদয় শত শত হৃদয়কে মুগ্ধ করিতে পারে; একটী প্রাণী অসংখ্য প্রাণের সঞ্জীবতা দিতে পারে; একটী হৃদয় ভক্তির অক্ষয় ভাণ্ডার সঞ্চিত রাখিতে পারে চৈতন্যের জীবন তাহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য। চৈতন্য নিজে ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন অনেককে দীক্ষিত করিলেন কিন্তু ধর্ম্মের জন্য পূর্ব্বাবধি তাঁহার হৃদয় যেমন উপযোগী ছিল অন্যের হৃদয় সেরূপ ছিল না। অল্প দিনের মধ্যেই চৈতন্যের অসংখ্য শিষ্য হইল কিন্তু এ পর্য্যন্ত ও তিনি প্রকাশ্যরূপে ধর্ম্মমত প্রচার করেন নাই। নূতন শিষ্য লইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইল; কিন্তু তিনি পরিশ্রমে কাতর নহেন, অনন্ত বল তাঁহার হৃদয়ে নিহিত; প্রগাঢ় ভক্তি তাঁহার অবিচ্ছিন্ন নেত্রী, উদ্দেশ্য সাধন পথে বিপত্তিই তাঁহার উত্তেজনা শক্তি। কি প্রকারে শিষ্যগণের ধর্ম্মে অনুরক্তি জন্মে, ভক্তি ও

চিন্তার সমাবেশ হয় এই চিন্তা তাঁহার প্রবল হইল। এ দুর্ব্বোধ্য তত্ত্ব সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। যিনি নিজের হৃদয়ে ভক্তি, চিন্তা ও অনুরক্তির সমাবেশ বুঝিতে পারিয়াছেন তিনি মনের কথা খুলিয়া অন্যকে বুঝাইতে পারেন। অতুল উৎসাহে চৈতন্য শিষ্যগণকে ধর্ম্ম কি বুঝাইলেন, ধর্ম্ম-সাধনের উপায় কি দেখাইলেন, ধর্ম্মজীবনের শেষগতি কি বলিয়া দিলেন।

ক্রমে ক্রমে চতুর্দ্দিকে প্রচার হইয়া গেল যে চৈতন্য বৈষ্ণব-ধর্ম্মে উন্মত্তপ্রায়; এই কথা শুনিবা মাত্র অন্যান্য বৈষ্ণবগণ চৈতন্যের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। চৈতন্য বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য, প্রগাঢ় ভক্তিতে উন্মত্ত ও উদ্ধৃতমন; কখন বা গগন বিদীর্ণ করিয়া "হরি বল" বলিয়া মুক্তকণ্ঠে চীৎকার করিতেছেন; কখন বা ভক্তির আবেগে অবরুদ্ধ-কণ্ঠ হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইতেছেন। সমাগত বৈষ্ণবগণ দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত; ভক্তির প্রভাবে প্রাণী এত উন্মত্ত হইতে পারে তাঁহারা এই প্রথম দেখিলেন। জগতে যাঁহার ভক্তি জীব মাত্রেরই আদর্শ; চিন্তা, ভক্তি ও অনুরক্তি যাঁহার ধর্ম্মসাধনের একমাত্র উপায় আজ তিনি ভক্তিতে উন্মত্ত ও উদ্ধৃতমন। আজ জগতবাসী দিব্যচক্ষে চৈতন্যের অবিচলিত বিশ্বাসের প্রভাব দেখুন! বঙ্গের ধর্ম্ম-শিক্ষক আজ কিসের জন্য পাগল; যিনি যত বুঝেন তাঁহার তত বুঝিবার ইচ্ছা জন্মে; বুঝিতে গিয়া অতল চিন্তায় ডুবিয়া পড়েন

ও আত্মহারা হয়েন; আত্মহারা হইয়া শেষে পাইলাম না—তৃপ্তি পাইলাম না বলিয়া হতাশ হয়েন। চৈতন্যের আজ সেই অবস্থা, কখন বা জ্ঞানচক্ষে বিশ্ব নিয়ন্তাকে উপস্থিত দেখিতেছেন "কিন্তু ভক্তিভরে আলিঙ্গন করিতে গিয়া হারাইতেছেন; কখন বা নিজেকে পূর্ণকাম মনে করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইতেছেন। অধ্যাপনা কার্য্যে চৈতন্য যেরূপ অদ্বিতীয় হইয়াছিলেন ধর্ম্ম-শিক্ষা বিধানেও তিনি তদ্রূপ হইলেন, দিন দিন তাহার দল পুষ্ট হইতে লাগিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রেমের উন্মত্ততা।

চৈতন্যের হৃদয় বিশুদ্ধ প্রেমের অনন্ত উৎস; অনন্ত উৎস বলিয়াই চৈতন্য প্রেমে উ[illegible], আত্ম বিস্মৃত ও অনুরক্ত। অনু-রক্তি পাত্র বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া অঙ্কুরিত ও প্রকাশিত হয়; চৈতন্যের অনুরাগের এক মাত্র লক্ষ্য—হরি! প্রকৃত এবং বিকৃত মানুষ লইয়াই সংসার। যাহারা প্রকৃত মানুষ তাহাদের হৃদয় সরস ও উর্ব্বর; যাহারা বিকৃত, তাহাদের হৃদয় সংসারে মরু-ভূমি, অন্তর্জগতে মহা শশ্মান! যাহাদের হৃদয় সরস তাহারা

সকলেই উন্মত্ত। কেহ রূপ লইয়া পাগল, কেহ ধন মান লইয়া পাগল—কেহ বিশ্ব সংসারকে ভালবাসিয়াই পাগল। চৈতন্য-দেব শুধু ভগবানের প্রেমে পাগল হইয়াছিলেন। বঙ্গভূমিতে ধন, মান, রূপ, যৌবনের পাগলের অভাব নাই;—কিন্তু শত শতাব্দিতেও এক চৈতন্য বই প্রেমের পাগল আর জন্মিল না এই দুঃখ!! ভগবানের বিশুদ্ধ প্রেমে যাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হয় তাহার কিছুতেই পরিতৃপ্তি জন্মে না; প্রেম যত বাড়ে তত তাহার বাড়িবার গতি জন্মে; এগতির শেষ নাই; এ ইচ্ছার তৃপ্তি নাই, বিরতি নাই। প্রেম বিকাশের কত পথ উন্মুক্ত ও পর্য্যায়ক্রমে রুদ্ধ হইল কিছুতেই চৈতন্যের সন্তোষ জন্মিল না কিরূপে পূজ্য জনের প্রতি আন্তরিক ভক্তি প্রকাশ করিবেন ইহাই তাঁহার অনিবার্য্য চিন্তা; পরিশেষে এক নূতন পথ আবিষ্কার করিলেন—জ্ঞানবৃদ্ধ ভক্তগণের পরিচর্য্যা করাই তাঁহার এক মাত্র কার্য্য হইল। শ্রীবাস প্রমুখাদি বৈষ্ণবগণ দেখিলে তিনি ধুলায় লুন্ঠিত হইয়া প্রণাম করেন; পথিমধ্যে স্নানার্থী বৈষ্ণব দেখিলে সাগ্রহে তাহার শুষ্ক বস্ত্র ও পূজার দ্রব্যাদি নদীর ঘাটে লইয়া গিয়া সেবকোচিত কার্য্যাদিকরিতে লাগিলেন। তিনি প্রণাম করিলে শ্রীবাসাদি ভক্তগণ এই বলিয়া চৈতন্যকে আশীর্ব্বাদ করিতেন যে, ভগবানের প্রতি তোমার দৃঢ় ভক্তি হউক, মুখে সর্ব্বদা হরিনাম বল, হৃদয়ে তাঁহাকে ধ্যান কর, হরির কৃপা ভিন্ন মনুষ্যের মুক্তির আর কোন উপায় নাই

চৈতন্য জ্ঞানবৃদ্ধ ভক্তগণের মুখে এইরূপ আশীর্ব্বাদ শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিতেন এবং বলিতেন আপনাদের অনুগ্রহ না হইলে হরিভক্তি লাভ করা যায় না; ভক্তদিগকে সেবা না করিলে হরিভক্তি হৃদয়ে স্থান পায় না; যখন আপনারা সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন তখন নিশ্চয়ই বুঝিলাম আমি হরি ভক্তি লাভে পরিণামে সক্ষম হইব। এই বলিয়া চৈতন্য ভাবে উন্মত্ত হইয়া ভক্তগণের পদতলে লুণ্ঠিত হইতেন। নদীতীরে গিয়া তিনি ভক্তগণের আর্দ্রবস্ত্র নিংড়াইয়া দেন, কাহারও বা শুষ্ক বস্ত্র হাতে লইয়া রৌদ্রে দাঁড়াইয়া থাকেন, পূজার সময় পূজার্থীগণের সম্মুখে পূজার দ্রব্যাদি স্থাপন করেন। ভক্তগণ পুনঃপুনঃ নিষেধ করিলেও তিনি ঐ রূপ কার্য্য করেন; এরূপ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন যে হরিকে ভালবাসিতে চায় সে প্রথমে হরির প্রিয় শিষ্যদিগকে ভাল বাসুক। চৈতন্যের উত্তরে ভক্তগণ প্রীত হইয়া বলিতেন তুমিই নবদ্বীপ পবিত্র করিবে, তোমা হইতে আমাদেরও পাপ মুক্ত হইবে, পূর্ণকাম হইবার আর তোমার বিলম্ব নাই; তোমার শাস্ত্রজ্ঞান যেরূপ গভীর হরিভক্তিও তদ্রূপ হউক এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। চৈতন্য এ সকল কথায় স্থির থাকিতে পারিতেন না, ভক্তগণের পদধূলি লইয়া যোড় হস্তে তাঁহাদের নিকট ভক্তি ভিক্ষা করিতেন। লোকে মনে করিতে লাগিল

নিমাই প্রেমে পাগল হইয়াছে; তাহার কিছু মাত্র মান অপমান বোধ নাই; ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া জাতি বিচার করে না, অস্পৃশ্য জ্ঞান করে না, কেবল নিজে যাহা ভাল মনে করে তাহাই একমনে করিতে থাকে। চারিদিক হইতে চৈতন্যের নিন্দা হইতে লাগিল; তাঁহাকে এখন এরূপ ঘৃণিত কার্য্য হইতে কে বিরত করিবে? জগন্নাথ মিশ্র আর এ জগতে নাই, শচী দেবীও শোকে কাতরা ও একমাত্র পুত্রের স্নেহে তাঁহার পক্ষপাতিনী। গ্রামের মধ্যে মহা আন্দোলন চলিতে লাগিল; চৈতন্যদেব অকাতরে সমস্ত সহ্য করিলেন; তিনি নিজে যাহা বুঝিয়াছেন তাহা যেরূপই হউক করিবেন। অনেকে নিষেধ করিতে লাগিল, কেহবা প্রাণনাশেরও ভয় দেখাইতে লাগিল তিনি কিছুতেই ভীত হইলেন না; মনের ঐকান্তিক অনুরাগে সজ্জনের সেবা করিতে লাগিলেন। এরূপ ব্যবহারে অনেকে বিরক্ত হইলেন কিন্তু বিনয় চৈতন্যের স্বভাবের প্রধান উপকরণ; লোকে রুষ্ট হইলে কিরূপে তাহাদের প্রীতি সাধন করিতে হয় তাহা তিনি জানিতেন, সুতরাং কেহই তাঁহার উপর আন্তরিক অসন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না। একদিন একজন বৈষ্ণব চৈতন্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কেন পাগলের মত এরূপ জঘন্য কার্য্য করিতেছেন; চৈতন্য বলিলেন দ্বিতল অট্টালিকায় উঠিতে হইলে যেরূপ সোপান আশ্রয় করিয়া উঠিতে হয় সেইরূপ হরিভক্তি লাভ করিতে হইলেও হরির অনুগত শিষ্যগণের ভক্তি শিক্ষা,

করিতে হয়; আমাকে আপনাদের সেবক বলিয়া জানিবেন, আপনাদিগের সেবা করিতে না পারিলে আমি কোন রূপেই হরিকে সেবা করিতে পারিব না; যে জগতের প্রাণীকে প্রীতি করে সে জগতস্রষ্টা ভগবানের প্রীতি সাধন করে। চৈতন্যের কথায় বৈষ্ণব নিরুত্তর হইলেন, তাঁহার হৃদয়ে যে বাস্তবিকই অনাদি পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে একথা সহজেই বুঝিতে পারিলেন।

একদিন নবদ্বীপের প্রাচীন বৈষ্ণবগণ একত্রিত হইয়া শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাটীতে হরিগুণ কীর্ত্তন করিতেছেন এমন সময় চৈতন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। চৈতন্যকে দেখিবা মাত্র সকলেই সাদরে তাঁহাকে দলের মধ্যে লইয়া বসাইলেন। চৈতন্যের বাহ্য জ্ঞান নাই, তিনি হরিগুণ শুনিবা মাত্রই এত বিহ্বল হইয়া পড়িলেন যে মনের আবেগে বলিয়া উঠিলেন আমি হরিকে দেখা পাইয়া হারাইলাম, তিনি কোথায় গেলেন। এই বলিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন, ভক্তগণও তাঁহার রোদনে আন্তরিক মনোবেদনা বুঝিতে পারিয়া রোদন করিতে লাগিল; রোদনের ধ্বনিতে শুক্লাম্বরের ভবন প্রতিধ্বনিত হইল। চৈতন্য সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছেন, মধ্যে মধ্যে দাঁড়াইবার চেষ্টা করেন কিন্তু পারেন না; কিছুক্ষণ পরে স্থির হইলেন কিন্তু মনের আবেগ শান্ত হইল না। ভক্তগণের গলা ধরিয়া "আমি পাপিষ্ঠ নতুবা এরূপ ধন পাইয়া

রাখিতে পারিলাম না” এই বলিয়া মুক্তস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সম্মুখে গদাধরকে দেখিয়া চৈতন্য ব্যাকুল হৃদয়ে বলিলেন ভাই গদাধর! তুমি ধন্য, বাল্যকাল হইতে তুমি হরিভক্তি লাভ করিয়া জীবন সফল করিয়াছ, আমার জন্ম ও জীবনধারণ বৃথা, সংসারে আসিয়া কিছুই করিতে পারিলাম না; যে ধনের জন্য এত সাধনা, সে ধন পাইয়াছিলাম কিন্তু রাখিতে পারিলাম না। এই বলিয়া তিনি গদাধরের পদতলে লুণ্ঠিত হইলেন। প্রকৃত ভক্ত জগৎ হইতে মানের প্রত্যাশা করেন না, নিজকে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া কি ধনী, কি নির্ধন, কি মহৎ, কি নীচ সকলের পদতলেই লুণ্ঠিত হয়েন। ভক্ত জগতের ঐশ্বর্য্য চাহেন না, সমাজের আধিপত্য চাহেন না, সংসারের মায়ায় মুগ্ধ হইতে চাহেন না, তিনি কেবল অনাদি পুরুষের প্রীতি সাধনে ব্যাকুল, তাঁহার হৃদয় ভক্তিলাভে যত্নবান।

চৈতন্যের মনোবিকারের কথা নবদ্বীপে গোপন থাকিল না। প্রেমিকের হৃদয় যে তরঙ্গপূর্ণ সাগরের ন্যায় অস্থির তাহা তৎসদৃশ ব্যক্তি ভিন্ন আর কে বুঝিতে পারে? ক্রমে ক্রমে সকলেই জানিতে পারিল যে চৈতন্য প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছেন, তাঁহাতে আর মনুষ্যত্বের সত্বা নাই, দেবভাবের সম্পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে, চৈতন্যও কোন সময়ে হাসিতেন কোন সময়ে কাঁদিতেন, কখন বা সহসা হরি! হরি! হরি! বলিয়া মুক্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিতেন; শাক্ত দেখিলে পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া চিহ্ন

চাঞ্চল্য ও উন্মত্ততার ভাব প্রকাশ করিতেন। চৈতন্যকে ভূতে পাইয়াছে, তাঁহার বায়ুরোগ হইয়াছে প্রভৃতি জনরব প্রচার হইতে লাগিল। শচীদেবী একমাত্র পুত্রের এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া লোকে যাহা বলিতে লাগিল তাহাতেই বিশ্বাস করিয়া পুত্রকে প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চৈতন্য প্রেম পিপাসু হইয়া যে অনিবার্য্য তৃষ্ণার জ্বালায় অস্থির তাহা দূর করে কাহার সাধ্য? শচীদেবী পুত্রকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য অনেক ঔষধাদি প্রস্তুত করিলেন, কিছুই ফলদায়ক হইল না। অবশেষে তিনি ভগ্নহৃদয়ে বয়োবৃদ্ধ ভক্তগণের নিকটে পুত্রের দুর্দ্দশা জ্ঞাপন করিলেন। চৈতন্যের উন্মত্ততার কারণ তাঁহাদের অবিদিত ছিল না, কাজেই চৈতন্যকে কোন কথা না বলিয়া ভক্তগণ শচীদেবীকে চৈতন্যের দেবভাবের কথা বুঝাইয়া দিলেন। শচীদেবীও কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন; পুত্র যে ঐশী শক্তিতে শক্তিমান তাহাও তাঁহার অজ্ঞাত রহিল না। এই সময় হইতে শচীদেবী আর কখন পুত্রের প্রতি বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিতেন না। বাতাস উঠিলেই নদীর জল যেরূপ আলোড়িত হয়, ভক্তির কথা হইলে চৈতন্যের হৃদয়ও আনন্দে সেইরূপ নাচিয়া উঠিত, কিন্তু এ আনন্দ স্থির থাকিত না কাঁদিয়া মাটিতে না গড়াইলে এ আনন্দের শেষ হইত না!

একদিন চৈতন্য গদাধরের সঙ্গে অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত দেখা করিতে চলিলেন। অদ্বৈত একবারমাত্র চৈতন্যের শৈশবকালে

বিশ্বরূপের সঙ্গে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, আর কখন তিনি তাঁহাকে দেখেন নাই; কিন্তু সকলের মনেই তাঁহার সৌন্দর্য্য ও আকৃতির একপ্রকার ধারণা ছিল; বহুদিনের পরে দেখিবা-মাত্রই অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। চৈতন্যকে দেখিবামাত্র অদ্বৈত বাহুপ্রসারণ করিয়া উন্মাদচিত্তে আলিঙ্গন করিলেন, চক্ষু হইতে প্রেমাশ্রু অবিরল ধারায় পড়িতে লাগিল; ভাবের উচ্ছ্বাসে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, তিনি কেবল চিত্রিত ছবির ন্যায় সজলনয়নে চৈতন্যকে দেখিতে লাগিলেন। নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থান যেরূপ তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে আলোড়িত ও কম্পিত হইয়া উঠে, ভক্তদ্বয়ের সম্মিলনেও উভয়ের ভক্তি তরঙ্গের সংঘর্ষণ হইল, সংঘর্ষিত তরঙ্গমালা হৃদয়দ্বয় অতিবর্ত্তন করিল; উভয়েই নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। উভয়ে অনেকক্ষণ এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া যেন চৈতন্য পাই-লেন। অদ্বৈতাচার্য্য চৈতন্য অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ হইলেও পাদ্য অর্ঘ্যদান প্রভৃতি সেবকোচিত কার্য্যে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য একদিন গীতার কোন একস্থানের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া অনাহারে নিদ্রিত হইয়াছিলেন, নিদ্রা-বস্থায় কে যেন আসিয়া তাঁহাকে বলিল, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে; এতকাল তুমি যে ভক্তির জন্য অনাহারে সাধনা করিয়াছ তাহা সফল হইবে। অচিরাৎ একজন মহাত্মা দেশে, নগরে, এবং দ্বারে দ্বারে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া অকাতরে ভক্তি বিতরণ

করিবেন। চৈতন্যই যে এই অদ্বিতীয় মহাপুরুষ, ইনিই যে বঙ্গের দ্বারে দ্বারে হরিনাম কীর্ত্তন করিবেন, ইহা অদ্বৈতের অচল বিশ্বাস; সেই চৈতন্য গৃহে উপস্থিত—ইহা অপেক্ষা আর তাঁহার আনন্দের বিষয় কি? তিনি কিরূপে হৃদয়ের গভীর ভক্তি প্রকাশ করিবেন এই চিন্তায় অস্থির; কাহারও বাক্যস্ফূরিত হইল না, অনেকক্ষণ পরে উভয়ে কিছু শান্ত হইলেন, হৃদয়ের বেগ হতবল হইল। গদাধর এ দৃশ্য দেখিয়া নির্ব্বাক বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হইয়া উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন। চৈতন্যও অদ্বৈতাচার্য্যের ধর্ম্মালাপ আরম্ভ হইল। অদ্বৈতাচার্য্য চৈতন্যদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন প্রভো! আপনি সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন সাধনা ভিন্ন ভক্তি লাভ হয় না এবং ভক্তিলাভ না হইলে চিরশান্তি ভোগ করিতে পারা যায় না। একথা সত্য; কিন্তু ভক্তির সাধনা কি তাহা এ পর্য্যন্ত বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। চৈতন্য বলিলেন আপনি আমা অপেক্ষা বহুদর্শী, এ সকল বিষয়ে আমি আপনার শিষ্য হইবার উপযুক্ত পাত্র, তবে যখন জিজ্ঞাসা করিলেন যাহা জানি ও বুঝিয়াছি তাহাই বলিতে সাহসী হইতেছি। প্রাচীন ভক্তগণ বিনয়কে ভক্তির প্রথম সাধন বলিয়া গিয়াছেন; কোন প্রকার অভিমান অন্তরে থাকিলে ভক্তি লাভ হইতে পাবে না ইহা তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। নিজেকে অপবিত্র ও নীচ মনে করিতে হইবে; অন্যকে মহৎ ও সদাশয় মনে করিয়া তাঁহার আদেশ অবনত

শিরে পালন করিতে হইবে। সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা ভক্তির দ্বিতীয় সাধন।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ',

তৃণ অপেক্ষা নীচ এবং তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু হইয়া সর্ব্বদা নিরভিমানী থাকিয়া অন্যকে সম্মান পূর্ব্বক সতত হরি-সংকীর্ত্তন করিতে হইবে। ভগবানের নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে হইবে; শরণাপন্ন হইয়া একান্ত মনে তাঁহারই সেবা করিতে হইবে; তাঁহাকে অর্চ্চনা, বন্দনা ও প্রার্থনা করিতে হইবে; এই নবাঙ্গ সাধন ভক্তিলাভের প্রধান উপায়। ভক্তি ভিন্ন জগতের নরনারী একহৃদয় হইতে পারে না।

"শ্বপচোঽপি মহীপালো বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ।
বিষ্ণুভক্তি বিহীনোঽপি যতিশ্চ শ্বপচাধিপঃ॥"

চণ্ডালেও বিষ্ণুভক্তিলাভ করিলে মহীপাল এবং ব্রাহ্মণ হইতে অধিক সম্মানের পাত্র হয়; ভক্তিবিহীন যতিও চণ্ডালের সমান;

"শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং স্বপচং তথা।
বীক্ষাতে জাতি সামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥"

ভক্তকে শূদ্র, চণ্ডাল বা অন্য কোন নীচ জাতি বলিয়া ঘৃণা করিলে নিশ্চয়ই তাহাকে নরকগামী হইতে হয়। সকল প্রকার কপটতা ত্যাগ করিয়া সাধনা করিতে হইবে তাহা হইলেই

বিশুদ্ধ ভক্তি লাভ হইবে। এইরূপ অনেক কথার পর অদ্বৈতাচার্য্য বলিলেন, আপনিই বৈষ্ণব দলের এক মাত্র সম্বল ও নেতা, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি আমার দ্বারা কোন কার্য্যের সুসাধনের সম্ভাবনা নাই; ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুষ্ঠান রত ভক্তগণ যাহাতে উন্নত হয় তাহাই আমার ইচ্ছা। অদ্বৈতাচার্য্য কর্তৃক কর্ত্তব্য জ্ঞানে উদ্দীপ্ত হইয়া চৈতন্য আলয়ে আসিলেন। এতদিন পরে চৈতন্য দেব বুঝিতে পারিলেন যে ধর্ম্মজগতে তাঁহার কর্ত্তব্য এপর্য্যন্ত অসম্পন্ন রহিয়াছে, তাঁহাকে সমাজের পুষ্টি সাধন ও ধর্ম্মবল বৃদ্ধি করিতে হইবে, জাতি বৈষম্যকে দূরীভূত করিয়া সকলকে পবিত্র ভ্রাতৃবন্ধনে বাঁধিতেহইবে, ভক্তি হীন জগতে বিশ্বাসের শক্তি বুঝাইতে হইবে। হৃদয়ের গভীর প্রদেশে কর্ত্তব্য জ্ঞানের আঘাত লাগিল; মহাপুরুষের চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল। বিনয়ের অভাব ছিল না, বলের অভাব ছিল না, দৃঢ় প্রতিজ্ঞার অভাব ছিল না, কাজেই উদ্দেশ্য সাধন কষ্টকর হইল না। প্রথমে তিনি হরিসংকীর্ত্তন দলের অধিনায়ক হইলেন, তাঁহার ভাবোন্মত্ততা ও ব্যাকুলতা দেখিয়া পাষণ্ডিদিগের জড় হৃদয়ও স্থির থাকিল না, সকলেই কৃতপাপের স্মৃতিতে অনুতপ্ত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। এইরূপে দিন যাইতে লাগিল; চৈতন্যের সংকীর্ত্তনের দল পুষ্ট হইতে লাগিল। অল্পদিনের মধ্যেই দল এত পুষ্ট হইল যে তাঁহাদের সকলের একত্র অবস্থান ও একসঙ্গে কীর্ত্তন করা সম্ভবপর হইল না। সকলের সঙ্গেই চৈতন্যের আত্মীয়তা সংস্থাপিত হইল।

কেহ আর কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে চাহেন না দলবদ্ধ হইয়া ধর্ম্মালোচনা করা সকলেরই ইচ্ছা; সকলেই প্রেমে উন্মত্ত। সকলেই চৈতন্যের অনুগত, চৈতন্যও সকলের প্রতি সমদর্শী। এক ধর্ম্মে সকলে দীক্ষিত, এক উদ্দেশ্যে সকলে উত্তেজিত, সকলের দীক্ষা গুরু এক; এরূপ অবস্থায় পরস্পরের অবিচ্ছিন্ন সৌহার্দ্দের উৎপত্তি স্বাভাবিক। ধর্ম্ম সূত্রে একপ্রাণতা সংস্থাপন, জাতীয় ভাব সংরক্ষণ ও ইন্দ্রিয় সংযমনই চৈতন্যের গূঢ় উদ্দেশ্য। ধর্ম্মের নীরস তত্ত্বে লোকের স্বাভাবিক আস্থা অসম্ভব; বিশেষতঃ প্রাকৃত লোকে স্বভাবতঃই বড় আমোদ প্রিয়; এই জন্য চৈতন্য সংকীর্ত্তন দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার সহজসাধ্য মনে করিয়াছিলেন; কার্য্যতঃ তাঁহার উপায়ই বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছিল। চৈতন্য কেবল শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন না; তৎসাময়িক লোকের চরিত্র, আচার, নীতি এবং রুচিতে তাঁহার বহুদর্শীতা ছিল, তিনি যাহা মনে করিতেন শতসহস্র বাধা ও বিপত্তি সত্ত্বেও তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেন; কার্য্যক্ষম সাহায্যকারীরও অভাব ছিল না; তিনি জীবনের উদ্দেশ্য নির্ণয়ে চিন্তাকুল হইয়া দিব্যচক্ষে দেখিতেন যে ধর্ম্মজগতে তাঁহার অনেক কায করিতে হইবে। অভক্তদিগের হৃদয়ে ভক্তি সঞ্চার, শাক্তদিগকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করাও সমাজ সংস্কার তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত; এ ব্রত সাধনে তিনি কখন পশ্চাৎপদ হন নাই; বিপদ দেখিলেও ভীত হইতেন না

কেবল আজ না হয় কাল হইবে এই বলিয়া সময়ের অপেক্ষা করিতেন।

অদ্বৈতাচার্য্য চৈতন্যের প্রতি ধর্ম্মসংস্কারের সম্পূর্ণ ভার দিয়া দূরস্থ হইলেন; চৈতন্যের সামাজিক দায়িত্ব বাড়িল; তিনিও এ দায়িত্ব শোধে অনুপযুক্ত ছিলেন না। সমাজ পুষ্ট, ধর্ম্ম বিস্তৃত ও জাতীয় একপ্রাণতা বর্দ্ধিত করিতে উপদিষ্ট হইয়াছেন তাঁহার হৃদয় আর নিশ্চিন্ত থাকিল না, সমাজের ঋণ হইতে কিসে মুক্ত হইবেন এই চিন্তায় ব্যাকুল হইলেন। এদিকে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে সমস্ত ভক্তগণ একত্রিত হইয়া শ্রীবাস পণ্ডিতের বাটীতে সংকীর্ত্তন করিতে লাগিল। প্রতিবাসীগণ একান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল; কেহবা রাজদ্বারে অভিযোগ, কেহবা অন্ধকার রাত্রিতে বৈষ্ণবদলের নেতৃগণকে হত্যা করিবার পরামর্শ করিল; মতৈক্যতার অভাবে কোন পরামর্শই কার্য্যে পরিণত হইল না। বৈষ্ণবদল চতুর্দ্দিক হইতে নানা-প্রকারের ভয় পাইতে লাগিল কিন্তু কিছুতেই তাহাদের হৃদয় বিচলিত হইল না; একান্ত মনে তাহারা নিজ নিজ ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত রহিল। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া গ্রামের লোকে জনরব তুলিল যে চৈতন্যকে ধরিবার জন্য নবাবের নিকট হইতে নৌকাযোগে লোক আসিতেছে। বৈষ্ণবদলে একথা প্রচারিত হইবামাত্র অনেকেই পলায়নোদ্যত হইলেন, ক্রমে ক্রমে চৈতন্য একথা শুনিলেন, ধর্ম্মের জন্য বিপদের সম্মুখীন

হইতে হইবে ইহা ধর্ম্মবীরের অপার আনন্দের বিষয়। চৈতন্য শিষ্যগণকে সমুৎসাহে বলিলেন নবাবের নিকট হইতে লোক আসিতেছে তজ্জন্য কাহারও অনিষ্ট হইবে না; আমি নিজে ধর্ম্মের জন্য অকাতরে সমস্ত কষ্ট সহ্য করিব; তোমরা সকলে ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাক। শিষ্যগণকে এইরূপে নিঃশঙ্ক করিয়া চৈতন্য সন্ন্যাসীর বেশ ধরিলেন, পরিধানে রক্তাম্বরবসন, গলায় উত্তরীয় ও রুদ্রাক্ষমালা, সর্ব্বাঙ্গ বিভূতিভূষিত, কেশরাশি উশৃঙ্খল ও জটাসদৃশ, দক্ষিণ হস্তে দণ্ড, বাম হস্তে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিলেন। অনুপম সৌন্দর্য্যের উপর সন্ন্যাসীর বেশ, এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! সন্ন্যাসীবেশে সজ্জিত হইয়া চৈতন্য সুরধনীতটে বেড়াইতে লাগিলেন। নির্ম্মল জলস্রোত, অবিশ্রান্ত কুল কুল ধ্বনি, সিকতাময় সুন্দর পুলিন, তরঙ্গের পর তরঙ্গের বিচিত্র খেলা, শীতল শীকর সম্পৃক্ত সুমন্দ পবন প্রভৃতি প্রকৃতির অরঞ্জিত দৃশ্যে চৈতন্যের ভাব উচ্ছ্বলিত হইল; নদীতটে স্থির থাকিতে না পারিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে শ্রীবাসের বাটীতে উপস্থিত হইলেন; শ্রীবাস তখন কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত ছিলেন; চৈতন্যকে সহসা এরূপ অবস্থায় দেখিয়া শ্রীবাস সশঙ্কিত ও নির্ব্বাক; চৈতন্য উত্তেজিত ও উদ্ধত। শ্রীবাসকে সম্মুখে দেখিয়া চৈতন্য সক্রোধে বলিলেন তুই এখনও নিশ্চিন্ত ভাবে গৃহকার্য্যে রত; বুড়া অদ্বৈত আমাকে একা ফেলিয়া কোথায় গেল? শ্রীবাস চৈতন্যের ভাব দেখিয়া বুঝিতে

পারিলেন যে তিনি উন্মত্তপ্রায়; আর কোন কথা বলিলেন না কেবল নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। এই রূপ গোল-যোগে বাটীর সকলে ভীত হইয়া নিকটস্থ হইয়া চৈত-ন্যকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে চৈতন্য প্রকৃতিস্থ হইয়া শ্রীবাসকে বলিলেন শ্রীবাস! নবা-বের লোকে ধরিয়া লইয়া যাইবে এভয়ে কি তুমিও ভীত? এখনও কি তোমার সে ভয় আছে? ধর্ম্মের জন্য আমি আত্ম-জীবন উৎসর্গ করিয়াছি, যদি কেহ ধরিতে আইসে আমি তোমাদের আগে যাইব, আমিই সকল সহ্য করিব, তোমাদের কোন ভয় নাই; এই বলিয়া চৈতন্য নীরব হইলেন; শ্রীবাস মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া আর বাক্যস্ফুরণ করিলেন না। নবাবের লোক ধরিবে এ মিথ্যা জনরব অল্পদিনেই বিলুপ্ত হইয়া গেল। চৈতন্যের শিষ্যগণের আর ভয় থাকিল না; আবার সকলে মহোৎসাহে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। শাক্ত দল যখন বুঝিতে পারিল যে চৈতন্য অমানুষিক বলে বলীয়ান; কিছুতেই তাহাকে শাসন করা যাইতে পারে না তখন তাহারা বৈষ্ণবদলের বিরুদ্ধাচরণ করিতে নিবৃত্ত হইল এবং ক্রমে ক্রমে চৈতন্যের শিষ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে লাগিল। ধর্ম্মের জয় চির-কাল ধর্ম্ম রাজ্যে চলিয়া আসিতেছে; শাক্তদলকে কেহ পরা-মর্শ দিল না, কেহ তাহাদিগের হৃদয়ে ধর্ম্মের ভাব প্রজ্জ্বলিত করিল না তাহারা আপনা হইতেই ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইল, সৎ-

পথের পথিক হইল। অবিকৃত সহজজ্ঞান কখনও মনুষ্যকে বিপথে লইয়া যায় না; উন্নতি মনুষ্যের প্রকৃতি—অধোন্নতি মনুষ্যের বিকৃতি ইহা জগতের ধর্ম্মনীতির অভ্রান্ত সত্য। প্রকৃত ধর্ম্ম সমাজ যেখানে প্রতিষ্ঠিত হইবে অধার্ম্মিকের সমাজ সেখানে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে; যেখানে ঐশী শক্তির প্রাদুর্ভাব সেখানে সামান্য মনুষ্যের সমষ্টিজনিত শক্তি মুহূর্ত্তের জন্যও তিষ্ঠিতে পারে না। চৈতন্যের ধর্ম্মসমাজ অকাতরে সকল অপবাদ সহ্য করিল, প্রতিদ্বন্দ্বীগণের ভ্রুকুটী দেখিয়াও নীরবে থাকিল; সময় আসিল, ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বীগণ আপনা হইতেই বশীভূত হইল। শাক্তদলও ক্রমে ক্রমে চৈতন্যদলের পক্ষপাতী হইল, এইরূপে দিন দিন চৈতন্যের দল ও বল বৃদ্ধি হইল, সকলেই জানিতে পারিল যে নবদ্বীপ হইতে যে ধর্ম্মপ্লাবন আসিতেছে অচিরাৎ তাহার প্রবল স্রোতে সমস্ত দেশ ভাসিয়া যাইবে।

সাগরের জলে প্রতিনিয়ত উত্তোলিত, শোষিত ও বাষ্পীকৃত হইলেও যেমন অন্তর্জলোৎসের অদৃশ্য বলে কখন নিঃশেষিত হয় না; অন্তরাত্মার চিরন্তন বলেও কখন চৈতন্যের উদ্দীপনা শক্তির স্তিমিত ভাব প্রকাশিত হইত না। চৈতন্য সার্ব্বজনীন প্রেমে প্রমত্ত ও একমাত্র ধর্ম্মানুমোদিত কর্ত্তব্যে উদ্দীপ্ত। বিপদে ধৈর্য্য, কার্য্যে অধ্যবসায়, ভবিষ্যতে ও আত্মশক্তিতে স্থির বিশ্বাস, দারিদ্র্যে ত্যাগস্বীকার তাঁহার কার্য্যের প্রধান অবলম্বন। ধর্ম্ম-

সংস্কারক মহাপুরুষগণের উদ্দেশ্য সাধনের সমর্থতায় যে দৃঢ় বিশ্বাস আবশ্যক সে বিশ্বাস তাঁহার মনে সর্ব্বদাই অবিকৃত থাকিত। ঈশ্বরের শক্তি যাঁহার সহায়, ধর্ম্ম যাঁহার কার্য্যের নেতা, সহিষ্ণুতা যাঁহার বিপত্তির প্রতিদ্বন্দ্বী, কর্ত্তব্য হইতে তাঁহার পদস্খলন অসম্ভব। ধর্ম্মবিপ্লব সাধনই চৈতন্যের লক্ষ্য— এ লক্ষ্যভেদের অব্যর্থ শর ভক্তি বিস্তার—সংকীর্ত্তনই এ ভক্তি বিস্তারের সহজ-সাধ্য উপায়। অন্তর্বিপ্লবেই ধর্ম্মবিপ্লবের সৃষ্টি হয়; এই ধর্ম্মবিপ্লবে পাপের শাস্তি পুণ্যের পুরস্কার হয়, নরকে স্বর্গীয় শান্তি ও ধর্ম্মের রাজ্য বদ্ধমূল হয়; আজন্মপুষ্ট কুসংস্কারের সমূল বিনাশ, ঐশীশক্তির অতুল ক্ষমতা প্রদর্শন, মানসিক গতির পরিবর্ত্তন, অভীষ্টকার্য্যের সফলতায় পরিণাম জ্ঞাপন করাই অন্তর্বিপ্লবের কার্য্য। এ বিপ্লবে ত্যাগস্বীকার, নিঃস্বার্থ ভাল বাসা, সমদর্শীতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা চাই, চৈতন্য কিছুরই অভাবী নহেন। তিনি জগতের শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া আত্মশক্তিকে কার্য্যসাধনের প্রধান বল মনে করিলেন। তিনি আজ আভ্যন্তরিক বলে বলীয়ান, সমস্ত জগত একীভূত হইয়াও তাঁহার দৃঢ় বিন্যস্ত পদকে রেখামাত্রও বিচলিত করিতে পারে না, বক্ষে বজ্র সমষ্টির আঘাতও তাঁহার কাছে অকিঞ্চিৎকর যাতনাদায়ক। আজ চৈতন্য ধর্ম্মবীর—নেপোলিয়ন, ওয়েলিংটন, ওয়াসিংটনের ন্যায় রণবীর নহেন; আজ চৈতন্য ধর্ম্মযুদ্ধের নেতা—থার্ম্মাপলি, পীরামিডস, ওয়াটার্লু, থানেশ্বর, হলদিঘাট, তাঁহার যুদ্ধক্ষেত্র

নহে—তুর্গম মানসক্ষেত্র তাঁহার যুদ্ধক্ষেত্র, তিনি আজ সম্মুখীন অরক্ষিত শত্রুশরীর ভেদ করিবেন না, পরোক্ষেজাতীয় হৃদয়ে ধর্ম্মের বল সঞ্চারিত করিবেন। অদ্বৈত তাঁহাব হৃদয়ে যে কর্ত্তব্যজ্ঞান নিহিত করিয়াছেন, তাহার উত্তেজনায় তিনি আজ সমস্ত জাতিকে একজাতি করিবাব জন্য প্রমত্ত, ধর্ম্মকে কেন্দ্রীভূত করিয়া-তিনি আজ সমাজ সংস্কাব, সাম্য ও ভ্রাতৃভাব সংস্থাপনে একাগ্রচিত্ত ; ধর্ম্ম ই যাঁহাব নেতা ও অবলম্বন, ধর্ম্মের জন্য যাঁহার জন্ম ও জীবন তাঁহাব অধঃপতনের পরাজয়ের বা কর্ত্তব্য স্খলনের সম্ভাবনা অতি অল্প। তিনি আজ যে উদ্দেশ্য সাধনে উন্মত্ত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সে উদ্দেশ্যে যদি একজন বঙ্গবাসীও নাচিত তাহা হইলে জাতীয় একপ্রাণতার মূল এত বিচ্ছিন্ন ও শিথিল হইত না, জাতীয় উত্তেজনা বিলুপ্ত হইত না, বৈষ-ম্যের সংঘর্ষণে বঙ্গদেশে দুর্দ্দশাগ্রস্থ, পদদলিত ও হীনসর্ব্বস্ব হইত না। যে সাম্য সংস্থাপনে চৈতন্যের জন্ম, সে সাম্য পতিত ভারতের অভ্যুত্থানের প্রথম সোপান। নবদীক্ষিত শিষ্যগণ লইয়া তিনি আজ বৈষম্য বিচ্ছিন্ন ধর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত, এক্ষেত্রে শাক্তদল তাঁহার প্রতিদ্বন্দী ; প্রতিদ্বন্দীর সংখ্যা অধিক দেখিয়া তিনি হীনবল, ভীত বা পশ্চাৎপদ হইলেন না, স্বার্থ-পর ও অধার্ম্মিক জনের বলের সমষ্টিকে অনল শিখায় তৃণপুঞ্জ মনে করিলেন। তাঁহার মনে স্থির বিশ্বাস ছিল যে অবিচ্ছিন্ন একতা ও লক্ষ্যে অটল দৃষ্টিই প্রকৃতবল, শাক্তদিগের এ

অভাব তাঁহার চক্ষে মূর্ত্তিমান। শাক্তদলের মতবৈষম্যই যে তাহাদের অন্তর্দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। এক উদ্দ্যেশ্যে শাক্তদল উত্তেজিত হইলেও উদ্দেশ্য সাধনোপায়ের সহায়তার অভাবে প্রতিদ্বন্দীগণ আপনা হইতেই বশীভূত হইবে ইহা তাঁহার অটল বিশ্বাস। নিজের শিষ্যবর্গ ভক্তিতে মাতোয়ারা, এক কার্য্যে উত্তেজিত, এক নেতার আদেশে ও শিক্ষায় দৃঢ়সংকল্প ও ভ্রাতৃভাবে একপ্রাণ। এইরূপ অনুকূল বলে বলীয়ান হইয়া চৈতন্য ধর্ম্মসংস্কারে সম্পূর্ণ উদ্যোগী হইয়াছেন; এমন সময়ে সংবাদ আসিল অদ্বিতীয় ভক্ত নিত্যানন্দ নন্দন আচার্য্যের বাটীতে উপস্থিত। দূর প্রবাহিত সাগরোদ্দেশে নদী যেমন ধাবিত হয়, নিত্যানন্দও মথুরা অবস্থিতি কালীন চৈতন্যের প্রগাঢ় ভক্তির কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য সেইরূপ নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। চৈতন্য নিত্যানন্দের আগমন সংবাদে আনন্দে অধীর হইয়া তাঁহাকে নিজ আলয়ে আনিবার মানসে সদলে নন্দন আচার্য্যের বাটীতে গেলেন। বেগবতী নদীদ্বয়ের ঘাত প্রতিঘাতে যেরূপ ভীষণ লহরীলীলার সৃষ্টি হয় ভক্তদ্বয়ের সম্মিলনে উভয়ের হৃদয়েও সেইরূপ ভাবের উচ্ছ্বাস উঠিল। চতুর্দ্দিকে চৈতন্যের শিষ্যগণের আনন্দসূচক ধ্বনিতে নবদ্বীপ নিনাদিত হইল।

নিত্যানন্দ ও চৈতন্যসদৃশ প্রতিভাশালী মহাপুরুষ, এক হব সন্ন্যাসীর সহবাসে ইহাঁর শৈশব, পৌগণ্ড ও কিশোর কাল

অতিবাহিত হয়। বীরভূম অঞ্চলে একচাকা গ্রামে হাড়ওঝার ঔরসে পদ্মাবতীর গর্ভে এই মহাপুরুষের জন্ম হয়। একদিন একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী হাড়ওঝার বাটীতে উপস্থিত হন; নিত্যানন্দ তখন নিতান্ত শিশু, তিনি একমনে বাহিরে বসিয়া খেলা করিতে ছিলেন, সন্ন্যাসী শিশুর আকারগত অপূর্ব্ব লক্ষণ দেখিয়া তাঁহার ভাবী জীবনের কল্পনা করিতেছেন, এমন সময়ে হাড়ওঝা বাটীর দ্বারে সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সাদরে তাঁহাকে বাটীর মধ্যে আনিয়া বসিবার আসনাদি দিয়া অতিথি সৎকারের আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন। হিন্দুর শাস্ত্রে অতিথি সর্ব্ব দেবময়; সুতরাং অতিথি সেবা পুণ্যের কায বলিয়া সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী হাড়ওঝার প্রার্থনায় আতিথ্য স্বীকার করিলেন; আহারাদি শেষ হইলে সন্ন্যাসী নিত্যানন্দকে ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন; হাড়ওঝা প্রার্থনা শুনিয়া বিস্মিত! কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া পদ্মাবতীর নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ বলিলেন; মায়ের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল; একমাত্র পুত্রের আশায় তাঁহারা এতদিন বাঁচিয়াছিলেন এক্ষণে কিরূপে বাঁচিবেন এই চিন্তা অসহ্য হইয়া উঠিল। স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই একমাত্র পুত্রের ভাবী বিরহ স্মরণ করিয়া শোকার্ত্ত হইলেন কিন্তু পারত্রিক অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া দৈবপ্রেরিত অতিথির ভিক্ষা প্রদানে অসম্মত হইলেন না; অন্তরের দুর্ব্বিষহ কষ্টে সন্ন্যাসীকে পুত্র দিলেন। এরূপ

কথিত আছে যে পুত্রশোকে দম্পতী দ্বয় তিন মাস অনাহারে দিন কাটাইয়াছিলেন। দানশীলতা এবং ত্যাগ স্বীকারের এরূপ জীবন্ত দৃষ্টান্ত অতি বিরল। স্বশোণিত-পুষ্টসন্তানকে কোন্ জননী অপরিচিত এবং অনিশ্চিতজীবন সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দিতে পারে? বার্দ্ধক্যের একমাত্র আশ্রয়, বিপদের এক মাত্র অবলম্বন, আঁধার সংসারের একমাত্র প্রদীপসদৃশ সন্তানকে কোন পিতা মাতা চিরজীবনের জন্য বিদায় দিতে পারে? যে জীবনের উপর দুইটী জীবনের সম্পূর্ণ নির্ভর সে জীবন ভিক্ষা প্রদান কিরূপ ধর্ম্মভয়ের, উদারতার ও মহান্ ভাবের আদর্শ দৃষ্টান্ত! অতিথির অপমানে সংসার শ্রীহীন হইবে, দুর্দ্দিন উপস্থিত হইবে এই ভয়ে দম্পতী-দ্বয় সন্ন্যাসীর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে সাহসী হইলেন না। কুসংস্কার হইলেও কেমন স্থির, পবিত্র ও জীবন্ত বিশ্বাস। সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক নানাশাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়া নিত্যানন্দও যৌবনে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং দেশে দেশে হরিনাম প্রচার করিতে থাকেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় সকল তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়া তিনি মথুরায় একটী সন্ন্যাসাশ্রম স্থাপন করেন; তাঁহার প্রভূত আধ্যাত্মিক বলে সে সময়ে আর্য্যদিগের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান কাশীর পণ্ডিতগণও বিস্মিত হইয়াছিলেন। সজ্জনের সহিত সজ্জনের পরিচয়, ভক্তের সহিত ভক্তের সহানুভূতি এবং এক ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন ভ্রাতৃভাব প্রকৃতি

সিদ্ধ—ধর্ম্মরাজ্যে এ নিয়ম অলঙ্ঘ্য। নিত্যানন্দ লোকের মুখে চৈতন্যের প্রেমোন্মত্ততার কথা শুনিতে পাইয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন; তিনি যে ভক্তিতে পাগল সে ভক্তিতে আরো পাগল আছে ইহা তাঁহার নিকট যে কিরূপ সুখের সংবাদ, কিরূপ উৎসাহের অন্তর্ভেদী মন্ত্র এবং কিরূপ আশাপূর্ণ জ্যোতিঃ তাহা ভাবুকের কল্পনার বিষয়। চৈতন্যের অশ্রুতপূর্ব্ব ভক্তির কথা শুনিয়া নিত্যানন্দ স্থির হইতে পারিলেন না; কতিপয় বিশ্বস্ত শিষ্যের সহিত পদব্রজে নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। বৈষ্ণবদল মহা আনন্দে হরিনামের ধ্বনিতে গগণ বিদীর্ণ করিয়া নিত্যানন্দকে স্বদলে গ্রহণ করিলেন। চৈতন্যের সহিত নিত্যানন্দের মিলনে ভক্তদল পুষ্টাবয়ব এবং প্রবল শক্তি-দ্বয় একত্রিত হইল। যে সময়ে বঙ্গদেশে অসীম উৎসাহের আকর চৈতন্যের সঙ্গে প্রগাঢ় বক্তৃতাপূর্ণ নিত্যানন্দ মিলিয়া হিন্দুসমাজে ধর্ম্মসংস্কারের নূতন পতাকা উড্ডীন করিলেন; ঠিক সেই সময়েই জর্ম্মানিদেশে অতুল অধ্যবসায়শীল বাগ্মীপ্রবর মার্টিন লুথারের সঙ্গে সুপণ্ডিত সুলেখক ও সুধীর প্রকৃতি মিলাঙ্কথান (Melancthon) মিলিত হইয়া পোপের সিংহা-সন কাঁপাইয়া ইউরোপে ধর্ম্মসংস্কারের নূতন ধ্বজা প্রোথিত করিতেছিলেন। চৈতন্যের গভীর ভক্তি ও নিত্যানন্দের অতলস্পর্শী বিজ্ঞতা একত্রিত হইল, ধর্ম্মসংস্কারের স্বর্গভেদী ভেরী বাজিয়া উঠিল! আর্য্যসমাজে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির এই

প্রথম জন্ম; পূর্ব্বে বৈধ অর্থাৎ সাধনপরতন্ত্রা ভক্তি বলবতী ছিল চৈতন্য অহৈতুকী মহা ভাবময়ী ভক্তির ভাব জগতে প্রথম প্রচারিত করিলেন। পূর্ব্বতন মহাপুরুষগণ ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব অবহেলা করিয়া কেবলমাত্র জ্ঞানও বিজ্ঞানের সাহায্যে তাঁহার শুদ্ধস্বরূপ চিন্তা করিতেন; কিন্তু চৈতন্য এবং তাঁহার সম্প্রদায় আনন্দস্বরূপ ব্যক্তিত্ব পূর্ণ ঈশ্বরের উপাসনায় নিবিষ্টচিত্ত হইলেন; এইরূপে ধর্ম্মের এক মহা-বিপ্লব উপস্থিত হইল; পাপীর শঙ্কা, ধার্ম্মিকের উৎসাহ বাড়িল; ধর্ম্মরাজ্যে তুমুল সংগ্রাম বাধিল—এ সংগ্রামে ভক্তি ও বিজ্ঞতাই জয়লাভ করিল। বৈষ্ণবেরা বলেন চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ ও নিত্যানন্দ বলরামের অবতার, চৈতন্য-চরিতামৃতে ও লিখিত আছে:—

"সেই নন্দসুত ইহা চৈতন্য গোঁসাই।
সেই বলদেব ইহা নিত্যানন্দ ভাই॥"

অতি অল্পকালের মধ্যেই চৈতন্য ও নিত্যানন্দের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব জন্মিল; সহোদর ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যেও এরূপ সদ্ভাব অতি বিরল, কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না; উভয়েরই শক্তি, ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞা একলক্ষ্যে নিবিষ্ট; উভয়েই ধর্ম্মসংস্কারে একপ্রাণ, এক কর্ত্তব্যে উত্তেজিত। ভক্ত-গণের এই মহা আনন্দের সময় অদ্বৈতাচার্য্যকে অনুপস্থিত দেখিয়া চৈতন্য তাঁহাকে নবদ্বীপে আনিবার জন্য শান্তিপুরে লোক পাঠাইলেন। অদ্বৈত সংবাদদাতার মুখে চৈতন্যকৃত

সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন, তথায় আর অপেক্ষা না করিয়া নবদ্বীপে আসিলেন। চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্য একত্র সম্মিলিত হওয়াতে বৈষ্ণবদলের বল সমধিক বৃদ্ধি হইল। অদ্বৈতাচার্য্য চৈতন্যের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়া ভক্তির পথ কথঞ্চিৎ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। এখন সেই মুক্ত পথে ত্রিস্রোতার প্রবল প্রবাহের ন্যায় সাধকত্রয়ের ভক্তির স্রোত ছুটিয়া চলিল!

ভক্তত্রয়ের সম্মিলনের কিছুদিন পরে পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি নামা জনৈক ভক্ত ও বিষয়াশক্ত পণ্ডিতের আগমন বার্ত্তা নবদ্বীপে প্রচারিত হইল; চৈতন্য কৌতূহলাবিশিষ্ট হইয়া গদাধরের সঙ্গে নবাগত ভক্তকে দেখিতে গেলেন। চট্টগ্রামে পুণ্ডরিক বিদ্যানিধির জন্ম হয়; জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বে নবদ্বীপ বাসী হইয়াছিলেন; বৈষয়িক কার্য্যানুরোধে পুনর্ব্বার জন্মভূমিতে গমন করেন। চৈতন্য যখন দেশ ভ্রমণে পূর্ব্ববাঙ্গালায় উপস্থিত হন, তদ্দেশবাসী সকলেই ইহাঁর আচার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছিল ইহাঁর প্রগাঢ় ভক্তির কথাও তদ্দেশবাসীর অজ্ঞাত ছিল না। পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি চৈতন্যের অশ্রুতপূর্ব্ব ভক্তির কথা অবগত হইয়া নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বিষয়ানুরাগ, বেশ-ভূষার পারিপাট্য, পার্থিব ঐশ্বর্য্যে মত্ততা দেখিয়া দর্শনার্থী বৈষ্ণব গণের আন্তরিক বিরক্তি জন্মিল। সর্ব্বাপেক্ষা চৈতন্যের সঙ্গী গদাধর প্রকাশ্যরূপে বিদ্যানিধির প্রতি আন্তরিক অশ্রদ্ধা প্রকাশ

করিলেন। চৈতন্যের আদেশক্রমে তদীয় শিষ্যগণ কর্ত্তৃক ভাগবতের কতিপয় শ্লোক পঠিত হইলে বিদ্যানিধি প্রেমাবেশে স্থির থাকিতে পারিলেন না; উপস্থিত বৈষ্ণবগণ বিদ্যানিধির গভীর প্রেমের উচ্ছ্বাস দেখিয়া বিস্মিত, মুগ্ধ ও কৃতঅশ্রদ্ধার জন্য অনুতপ্ত হইলেন; গদাধরও কৃতাপরাধের জন্য বিদ্যানিধির নিকট ক্ষমাপ্রার্থী এবং পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইলেন। চৈতন্য বিদ্যানিধিকে সঙ্গে করিয়া স্বীয় আলয়ে প্রত্যাগমন করিলেন। ভক্তের মেলা আরম্ভ হইল; অবিশ্রান্ত সংকীর্ত্তনে কাহারও বিরক্তি, ক্লান্তি বা বিরতি নাই; হৃদয় অনন্ত ভক্তিরসে আর্দ্র সজীব ও প্রফুল্ল। সরলচিত্ত ভক্তগণ ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে সংকীর্ত্তনে দিন কাটাইতেছেন এমন সময়ে শচীদেবী একদিন রজনীযোগে স্বপ্ন দেখিলেন যে চৈতন্য ও নিত্যানন্দ শিশু হইয়া ধূলি খেলা করিতেছেন, খেলা করিতে করিতে নিত্যানন্দ শচীদেবীকে বলিলেন মা! আমার ক্ষুধা পাইয়াছে, খাইতে দাও। প্রভাত হইবামাত্র শচীদেবী চৈতন্যকে স্বপ্নের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত বলিলেন; চৈতন্য জননীকে "একথা গোপনে রাখিও" এই বলিয়া ভোজনের জন্য নিত্যানন্দকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। নিত্যানন্দ স্নানান্তে চৈতন্যের আলয়ে আসিলেন; আহারান্তে দিবাবসান পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন হইল। আমরা অনেক অনুসন্ধানে চৈতন্যের প্রধান ভক্তগণের নাম সংগ্রহ করিয়াছি। বিদ্যানিধি, গদাধর,

হরিদাস, হিরণ্য, মুরারি, জগদানন্দ, বাসুদেব, শ্রীধর, শুক্লাম্বর, বুদ্ধিমন্তখাঁ, শ্রীমাম, কাশীশ্বর, ব্রহ্মানন্দ, পুরুষোত্তম প্রভৃতি ভক্তগণই চৈতন্যের সংকীর্ত্তনের প্রধান সহায় ছিলেন। কখন শ্রীবাসের গৃহে, কখন বা চন্দ্রশেখরের গৃহে, কখনবা চৈতন্যের নিজ গৃহেও কীর্ত্তন হইত। বৈষ্ণবদল বিশেষ পুষ্ট হওয়াতে তিন চারিদলে ভাগ হইয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইত কিন্তু প্রেমাবেশ হইলে সব দল এক হইয়া যাইত। এই সময়ে বৈষ্ণবগণের নিশীথ সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল, দিবারাত্র হরিনামে নবদ্বীপ নিয়ত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল!

সংকীর্ত্তনস্থানে শাক্তদলেব কিম্বা অন্য কোন লোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল; এজন্য নবদ্বীপবাসী অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী-গণ সংকীর্ত্তনে আন্তরিক বিরক্ত হইয়া বৈষ্ণবদলের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। কোন নূতন ধর্ম্মের প্রচার সময়ে সকল দেশেই এরূপ অত্যাচারের ঘটনা ইতিহাসে পাওয়া যায়, সক্রেটিসের মৃত্যু, মহম্মদের মক্কা হইতে মদিনায় পলায়ন মার্টিন লুথারের রাজদ্বারে অপমান, রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি হিন্দুদলের শত্রুতা ইহার জলন্ত সাক্ষ্য। শাক্তদলের অত্যাচারে বৈষ্ণবগণ ভগ্নোৎসাহ হইলেন না; প্রত্যুত্তঃ ধর্ম্ম-প্রচারে আরো দৃঢ়কল্প ও উৎসাহিত হইলেন। চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতকে নেতা পাইয়া বৈষ্ণবদলের নির্ভীকতা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছিল; শাক্তদলের অত্যাচারে চৈতন্যের

কোন শিষ্যই ভগ্নোদ্যম হইলেন না কাজেই অত্যাচারী-গণ নিবৃত্ত হইল।

চৈতন্যদেবের স্বভাব অতি উদার ছিল; অবকাশ পাইলেই তিনি প্রতিবাসিগণের বাটীতে বেড়াইতে যাইতেন এবং ছোট ছোট বালকদিগের সঙ্গে মহা আনন্দে খেলা করিতেন। এক দিন তিনি গঙ্গার ঘাটে আসিতেছিলেন এমন সময়ে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে বলিল তুমি কাল আমাকে তোমাদের সংকীর্ত্তন শুনিতে দাও নাই, তোমায় যেন কখন সংসারে থাকিতে না হয়; ব্রাহ্মণটী এই কথাবলিয়া তাঁহার উপবীত ছিড়িয়া দিল, তিনি কোন কথাই বলিলেন না কেবল ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিয়া হাঁসিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণটী মনে করিয়া ছিল যে চৈতন্য এইরূপ অন্যায় ব্যবহারের প্রতিশোধ লই-বেন কিন্তু যখন দেখিল যে তিনি কিছুমাত্র বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইলেন না তখন নিজেই কিছু অপ্রতিভ হইয়া চলিয়া গেল। চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও বিদ্যানিধি সম্মিলিত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন এমন সময়ে হরিদাস ঠাকুর (যবন হরিদাস) ইহাদিগের সঙ্গে মিলিত হইলেন। হরিদাসের হৃদয় অনন্ত ভক্তির উন্মুক্ত উৎস; শান্তিপুর অঞ্চলে বুড়নগ্রামে হরিদাসের জন্ম হয়; কাহার নিকটে ইনি ধর্ম্ম দীক্ষিত হন নাই, শান্তিপুরের সন্নিহিত বেনাপোলের বন মধ্যে হরিদাস ধ্যান ও সংকীর্ত্তন করিতেন। ইসলাম ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম

গ্রহণ করায় হরিদাস নবাব এবং কাজীকর্তৃক অপদস্থ, প্রহারিতও জলমগ্ন হইয়াও স্বীয় ভক্তি অচল রাখিয়াছিলেন। গ্রামস্থ জমিদার প্রেরিত বেশ্যা দ্বারা হরিদাসের ধ্যান ভঙ্গের চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু বেশ্যাদ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া ধ্যানে ক্ষান্ত হওয়া দূরে থাকুক হরিদাস বেশ্যাকেও বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। যাঁহার ভক্তি এত অটল, যাঁহার হৃদয়ের বল এত দৃঢ় তিনি আজ চৈতন্যের সঙ্গে ধর্ম্মপ্রচারে একত্রিত হইলেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রবাহিত নদী সকল যেমন দেশান্তর সিক্ত ও উর্ব্বর করিয়া পরিশেষে সাগরে আত্মসমর্পণ করে; নিত্যানন্দ, বিদ্যানিধি, হরিদাস প্রভৃতি মহাত্মাগণও সেইরূপ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া চৈতন্যের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। চৈতন্য ভক্তির, নিত্যানন্দ বিজ্ঞতার, অদ্বৈত বহুদর্শিতার, শ্রীবাস উৎসাহের এবং হরিদাস অটল ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া জগতে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। বৈষ্ণবগণও ইহঁাদিগের অবতার নির্ণয় করিতে বিমুখ হন নাই। তাঁহারা বলেন চৈতন্য ভগবানের, নিত্যানন্দ বলরামের, অদ্বৈত মহাদেবের, শ্রীবাস নারদের ও হরিদাস ব্রহ্মার অবতার। ধর্ম্ম রক্ষার জন্য চিরকালই মহাপুরুষগণ সংসারে জন্ম গ্রহণ করেন; কেবল অসাধারণ গুণের জন্যই গতপ্রাণ মহাপুরুষগণ অবতার ভ্রমে পূজিত হইয়া থাকেন; লোকেও ভ্রান্ত হইয়া তাঁহাদিগের জন্ম ও মৃত্যুকে আবির্ভাব এবং তিরোভাব বলিয়া থাকে। চৈতন্যদেব কোন

মহাশক্তির অবতার কি না তাহা প্রমাণ করা সহজ নহে, তবে তিনি যে একজন অসাধারণ পুরুষ তদ্বিষয়ে কোন সম্প্রদায়েরই সন্দেহ হইতে পারে না। যদি মহম্মদ, পার্কার, লুথার, যীশু ও নানককে মহাশক্তির অবতার বলিতে হয়; তাহা হইলে চৈতন্যকে অবতার বলিতে কাহারও যুক্তিমূলক আপত্তি থাকিতে পারে না।

চতুর্থ অধ্যায়।

এক দিন মহাত্মা চৈতন্য শিষ্যগণের সহিত ধর্ম্মালাপ করিতে করিতে বলিলেন দেখ সংসারের ধর্ম্মহীনতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে; লোকের মনে ভক্তি নাই, ভয় নাই, বিশ্বাস নাই; কেহই মুক্তির পথ খোঁজে না; পাপের অত্যাচার, দারিদ্র্য-তার কঠোরতা, ভক্তিহীন শুষ্ক জীবনের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমি নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছি। তিনি এই বলিয়া নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে আদেশ করিলেন যে, তোমরা আজ হইতে নব-দ্বীপের প্রতি গৃহে গিয়া এই মাত্র প্রার্থনা কর যে, "হরিনাম ভজ, হরিনাম বল, হরিনাম শিক্ষা কর" সমস্ত দিবস এইরূপে নবদ্বীপের গৃহে গৃহে বেড়াইয়া প্রতি রাত্রে আমাকে দিবসের সমস্ত কার্য্যের বিবরণ দিবে। নিত্যানন্দ এবং হরিদাস চৈত-

ন্যের আদেশে প্রফুল্ল হৃদয়ে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে বাহির হইলেন এবং প্রতি গৃহে গিয়া "তোমরা হরিনাম ভজ, হরিনাম বল, হরিনাম শিক্ষা কর" এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। সজ্জনের হৃদয় উদ্রিক্ত হইল, প্রেমের নিরুদ্ধ উৎস খুলিয়া গেল, শতধারে প্রেমের প্রস্রবণ হইতে প্রেমবারি উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। নবদ্বীপের সকলেই জানিতে পারিল মহাপুরুষ চৈতন্যদেব আজ হইতে প্রকাশ্যরূপে ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন; এতদিন যাহা কেহ করিতে পারেন নাই আজ তাহা হইতে চলিল, চতুর্দ্দিক হইতে নিত্যানন্দ ও হরিদাসের কীর্ত্তন শুনিবার জন্য জনতা হইতে লাগিল। এইরূপ প্রতিদিন নিত্যানন্দও হরিদাস নাম প্রচার করিয়া রাত্রিতে চৈতন্যের নিকট গিয়া প্রত্যাহিক ঘটনায় বিবরণ দিতে লাগিলেন। চৈতন্যও নিজের ব্রত পূর্ণ হইতেছে শুনিয়া সমধিক উৎসাহে ধর্ম্মের দুর্ব্বোধ্য তত্ত্ব সকল সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। পাষণ্ডদলের প্রাণে সার্ব্বজনিক প্রেমের প্রচার সহ্য হইল না; গোপনে গোপনে বৈষ্ণবদলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হইতে লাগিল; নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে কীর্ত্তন করিতে দেখিলে পাষণ্ডদলেরা লাঠী লইয়া প্রহার করিতে উদ্যত হইত, ঢিল নিক্ষেপ করিয়া সংকীর্ত্তনের ব্যাঘাত জন্মাইতে চেষ্টা করিত এবং সর্ব্বদাই উপহাস করিয়া তাহাদের বিরক্তি উৎপাদন করিতে প্রয়াস পাইত। প্রচারক দ্বয় পাষণ্ডদলের নির্ম্মম ব্যবহারে বিন্দুমাত্রও

ক্ষুব্ধ বা বিরক্ত হইলেন না; ধর্ম্মের জন্য অকাতরে সকল কষ্টই সহ্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রচার কার্য্য চলিতে লাগিল।

একদিন নিত্যানন্দ ও হরিদাস ধর্ম্ম প্রচারে বহির্গত হইয়া দেখিলেন পথের পার্শ্বে দুই জন মদ্যপায়ী পড়িয়া রহিয়াছে; তাহারা মধ্যে মধ্যে মারামরি ও গালাগালি করিতেছে এবং পথের লোকদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য ধাইয়া আসিতেছে। নিত্যানন্দ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া একজন পথিককে জিজ্ঞাসা করিলেন পথের পাশে ঐ যে দুই জন লোক ধুলায় লুণ্ঠিত হইতেছে এবং মারামারি করিতেছে উহারা কোথায় থাকে, কি জাতি, কেন ওরূপ করিতেছে? সে ব্যক্তি কহিল মহাশয়! উহারা দুই ভাই ব্রাহ্মণ সন্তান, সর্ব্বদা মদ্যপান করিয়া উন্মত্ত থাকে; চৌর্য্য, পরদার, নরহত্যা, গোমাংসের সহিত সুরাপান প্রভৃতি জঘন্য কার্য্যে উহারা সর্ব্বদাই নিযুক্ত; উহাদিগের অত্যাচারে আমাদের ধন, মান, প্রাণ কিছুই নিরাপদ নহে: সন্ধ্যা হইলে কেহই উহাদের জন্য ভয়ে বাটীর বাহির হয় না সকলেই উহাদের জন্য সশঙ্কিত থাকে। পাপের এই বিকট দৃশ্যে নিত্যানন্দের হৃদয় গলিয়া গেল; তিনি ভাবিলেন সংসারে এ নরকের সৃষ্টি হয় কেন? এ নরক যদি আবার স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ হইয়া স্বর্গ না হয় তাহা হইলে আর জগতে ধর্ম্মের জয় কোথায়? বাস্তবিক পাপের দৃশ্যে ধার্ম্মিকের হৃদয়ে ধর্ম্মের প্রখর তেজ দ্বিগুণীভূত হইতে থাকে ও প্রতিজ্ঞার বল বৈদ্যুতিক

শক্তিতে মনোরাজ্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে। ধর্ম্মরাজ্যে চির-কালই পাপ পুণ্যের তুমুল সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে; যিনি পাপের সংগ্রামে জয়ী; তিনি মহাপুরুষ, তিনি জগতের আদর্শ ও আরাধ্য। এই পৈশাচিক দৃশ্যে উদ্দীপ্ত হইয়া নিত্যানন্দ হরিদাসকে বলিলেন হরিদাস! জগতে যে এমন পাপী আছে ইহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না, যাহা হউক যেরূপেই পারি এই দুই জনকে সৎপথে আনিতে হইবে; তুমি আমার সহায় হও তাহা হইলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব। এইরূপ স্থির করিয়া দুই জন মদ্যপায়ীদ্বয়ের নিকট গিয়া বলিলেন ভাই হে! তোমরা হরিনাম ভজ, হরিনাম বল, হরি ভিন্ন পাপীর আর কোন উপায় নাই, তিনিই পাপীর একমাত্র সহায়, তোমরা একবার প্রাণ খুলিয়া তাঁহাকে ডাক, তোমাদের সকল দুঃখের অবসান হইবে। পাপীদ্বয় কীর্ত্তনের চীৎকারে মস্তক তুলিয়া মহাক্রোধে ভক্তদ্বয়কে মারিবার জন্য ধাবিত হইল; ভক্তদ্বয় আর কোন উপায় না দেখিয়া উর্দ্ধশ্বাসে চৈতন্যের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত ঘটনা বলিলেন। জগাই মাধাই ভক্তদ্বয়ের অনুসরণ করিয়াও ধরিতে পারিল না; অগত্যা গঙ্গার ঘাটে গিয়া পড়িয়া রহিল; কেহই আর উহাদের ভয়ে ঘাটে আসিতে পারে না; গ্রামের মধ্যে সকলেরই ভয় হইল যে আজ জগাই মাধাই যেন কাহার সর্ব্বনাশ করিতে নদীর ঘাটে পড়িয়া রহিয়াছে। চৈতন্যদেব সমস্ত ঘটনা শুনিয়া নিত্যানন্দকে বলিলেন যদি

এই দুই পাপীর উদ্ধার সাধন না হয় তাহা হইলে আর এতদিন কি করিলাম? পাপীর উদ্ধার ধার্ম্মিকের ব্রত; এস সকলে মিলিয়া পাপীদ্বয়ের হৃদয়ে হরিনামের শক্তি সঞ্চারিত করি, তাহা হইলেই উহারা সৎপথে আসিবে। এই স্থির করিয়া চৈতন্যদেব আদেশ করিলেন আজ সকলে একত্র হইয়া প্রাণ খুলিয়া নগরকীর্ত্তন করিও; হরিনামের গুণে পাপীর হৃদয় আপনিই বশীভূত হইবে। এরূপ বিপদাপন্ন হইয়াও নিত্যানন্দ নিজের উদ্দেশ্য ত্যাগ করিলেন না, বিশেষতঃ এরূপ কার্য্যে চৈতন্য কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছেন এই মনে করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা যত্ন সহকারে পাপীদ্বয়কে সৎপথে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার পর জগাই মাধাই চৈতন্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল, কখন গঙ্গার তটে, কখন কীর্ত্তন স্থলে কখন বা চৈতন্যের বাটীর চারিদিকে বেড়াইতে লাগিল; সন্ধ্যা হইলে কেহই তাহাদের ভয়ে বাটীর বাহির হইতে সাহস করিত না। কোন দিন বা জগাই মাধাই অলক্ষ্যভাবে সংকীর্ত্তন স্থলে উপস্থিত হইয়া সমস্ত রাত্রি সংকীর্ত্তন শুনিত এইরূপে উভয়ের মন ধর্ম্মের দিকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে আকৃষ্ট হইল। একদিন নগর কীর্ত্তন করিয়া আলয়ে প্রত্যাগমন সময়ে নিত্যানন্দের সহিত জগাই মাধাইয়ের দেখা হইল; পাপীদ্বয়ের ভীষণ মূর্ত্তি, রক্তিম লোচন, উশৃঙ্খল কেশপাশ, অসুর সদৃশ পরাক্রম দেখিয়া তিনি কিছু সঙ্কুচিত হইলেন। জগাই সরোষে নিত্যানন্দকে নাম ধাম

জিজ্ঞাসা করিল, নিত্যানন্দও যথোচিত প্রত্যুত্তর দিলেন এইরূপ কথা বার্ত্তা হইতেছে এমন সময়ে মাধাই নিত্যানন্দের মাথা লক্ষ্য করিয়া এমন বেগে কলসির কাণা নিক্ষেপ করিল যে তাঁহার মস্তক বিদ্ধ হইল ; অজস্রধারে শোণিত বহির্গত হইতে লাগিল। মাধাই ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া পুনর্ব্বার প্রহারোদ্যত হইল কিন্তু জগাইয়ের প্রতিবন্ধকতায় সফলকাম হইতে পারিল না। পথের লোকে এই ব্যাপার দেখিয়া চৈতন্যের নিকট নিত্যানন্দের অবস্থা জ্ঞাপন করিল ; চৈতন্য শুনিবা মাত্র শিষ্যগণের সহিত ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নিত্যানন্দের মস্তক হইতে অবিরল শোণিত ধারা বহিতেছে, তিনি নীরবে কিন্তু অক্ষুব্ধ চিত্তে পার্শ্বে দণ্ডায়মান। দেখিবা মাত্র চৈতন্য নির্ব্বাক কিন্তু নিত্যানন্দের কষ্ট দেখিয়া স্থির হইতে পারিলেন না, স্বীয় উত্তরীয় দ্বারা নিত্যানন্দের শোণিতাক্ত মস্তক বাঁধিয়া দিলেন। চৈতন্যকে নির্ব্বাক দেখিয়া নিত্যানন্দ ধীর স্বরে বলিলেন প্রভু শান্ত হউন, আমার জন্য ব্যস্ত হইবেন না, আমি আপনার নিকট এই পাপীদ্বয়ের জীবন ভিক্ষা করিতেছি ইহাদিগের শারীরিক দণ্ড দিলে কোন ফল হইবে না ; ইহাদিগকে ক্ষমা করিয়া উদ্ধার করুন ; জগাই আমাকে বাঁচাইয়াছে ইহাকে কিছুই বলিবেন না। চৈতন্য এই কথা শুনিয়া জগাইয়ের মুখপানে চাহিয়া, অন্তরের সহিত তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন ; আর কোন কথা না বলিয়া তিনি

আশ্রমাভিমুখে আসিলেন ; জগাই মাধাইও উৰ্দ্ধশ্বাসে তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। ভ্রাতৃদ্বয় চৈতন্যের বাটীর দ্বারে আসিয়া হৃদয়ের গভীর যাতনায় রোদন করিতে লাগিল। জগাই মাধাই কি উদ্দেশ্যে চৈতন্যের পশ্চাদ্ধাবমান হইতেছে জানিবার জন্য নবদ্বীপে বালক বৃদ্ধ নর নারী সকলেই দৌড়িয়া চৈতন্যের আলয়ে উপস্থিত হইল, গ্রামের মধ্যে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল যে আজ জগাই মাধাই চৈতন্যের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। চৈতন্যদেব ভ্রাতৃদ্বয়কে গৃহের মধ্যে লইয়া রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভ্রাতৃদ্বয় কাতর বচনে জীবনের কৃত পাপ সকল স্বীকার করিয়া বলিতে লাগিল আমাদের পাপের সংখ্যা নাই, আমাদের মুক্তি নাই, শান্তি নাই, এক্ষণে আমাদের পরিত্রাণের উপায় কি বলিয়া দিন এই বলিয়া উভয়েই কাতর স্বরে রোদন করিতে লাগিল। সমাগত দর্শকমণ্ডলী জগাই মাধাইয়ের কাতরতা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল, কেহই কারণ জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না ; সকলেই এক দৃষ্টে ভ্রাতৃ-দ্বয়ের প্রতি চাহিয়া রহিল। ভ্রাতৃদ্বয়ের কাতরতা দেখিয়া চৈতন্যের হৃদয় দুঃখে গলিয়া গেল ; তিনি স্থির থাকিতে না পারিয়া বলিলেন তোমাদের কোন ভয় নাই, আজ হইতে তোমাদের পাপের ভার আমি গ্রহণ করিব, তোমরা যখন পাপ কি বুঝিতে পারিয়াছ তখন তোমাদের অবশ্যই পাপ মোচন হইবে। এই বলিয়া তিনি ভ্রাতৃদ্বয়কে গঙ্গাতীরে লইয়া

গেলেন ; সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের লোক নদীর তীরে ছুটীল ; দুর্দ্দান্ত পাপী জগাই মাধাইয়ের মন আজ পবিত্র হইয়াছে তাহারা আজ পাপ মুক্ত হইবে এ জনরবে নবদ্বীপের সকলে নদীর ঘাটে উপস্থিত হইল। চৈতন্য ভ্রাতৃদ্বয়ের হস্তে এক একটী তুলসী পত্র দিয়া কহিলেন তোমরা উহা আমার হস্তে অর্পণ কর ; আমি তোমাদের সমস্ত পাপের ভার আজ হইতে গ্রহণ করিলাম, তোমাদিগকে আর পাপের যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতে হইবে না। ভ্রাতৃদ্বয় অবাক্‌ ও নিশ্চেষ্ট ; চৈতন্য পুনরায় পাপ ভিক্ষা করিলেন, ভ্রাতৃদ্বয় "কেমন করিয়া আপনার হাতে তুলসি দিব" এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। ভ্রাতৃদ্বয়ের আন্তরিক যাতনা দেখিয়া চৈতন্যের চক্ষে জল আসিল ; তিনি আবারও ভক্তি ভাবে হরিনাম করিয়া হাতপাতিয়া পাপ ভিক্ষা করিলেন। এবারে ভ্রাতৃদ্বয় চৈতন্যের হাতে তুলসীপত্র দিল চৈতন্য বলিলেন আজ হইতে তোমরা পাপমুক্ত হইলে ; এই কথা শুনিবামাত্র ভ্রাতৃদ্বয় আনন্দে হরিবোল দিয়া উঠিল চতুর্দ্দিক হইতে হরিবোলের ধ্বনিতে সুরধনীর বুক্ষ থর থর কাঁপিয়া উঠিল ; পবিত্র সলিলা ভাগিরথীতীরে পাপীদ্বয়ের জীবনের পাপ মহাপুরুষ চৈতন্যদেব অকাতরে গ্রহণ করিলেন। পাপীর আর্ত্তনাদে যাঁহার হৃদয় দয়ার্দ্র হইল, যিনি স্বেচ্ছায় পাপীর জীবনের পাপের ভার নিজে গ্রহণ করিলেন তাঁহার হৃদয় কত উচ্চ. কত মহান্‌। পাপীর দুর্গতি যাঁহার প্রাণে

সহিল না, অধর্ম্মের স্রোত যিনি দেখিতে পারিলেন না, পাপের যাতনায় প্রাণী ছট্‌ফট্‌ করে, স্বর্গীয় আলোক পাপীর হৃদয় আলোকিত করিতে পাবে না ইহা যাঁহার অসহ্য হইল; যিনি মুক্তকণ্ঠে বলিলেন পাপী হউক ধার্ম্মিক হউক, ব্রাহ্মণ হউক, চণ্ডাল হউক আমার কাছে আইস আমি তোমাদের পাপ ভিক্ষা করি, তোমাদের মুক্তির পথ দেখাইয়া দিতে প্রস্তুত রহিয়াছি তিনি জগতের পূজ্য, আদর্শ ও আরাধ্য—পাষণ্ডদিগকে যিনি প্রসন্নচিত্তে ক্ষমা করিয়া আলিঙ্গন করিলেন তাঁহার মহত্ত্ব কত গভীর তাঁহার জীবন যথার্থই ধর্ম্মের জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। বৈষ্ণবদলের মধ্যে নিত্যানন্দের, মান, মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বৃদ্ধি হইল; না হইবে কেন, ধর্ম্মের জন্য যিনি আজন্ম হইতে শিক্ষিত ত্যাগস্বীকারে অকুণ্ঠিত, পরোপকারে দীক্ষিত হইয়াছেন তাঁহার কাছে এরূপ কার্য্য অকিঞ্চিৎকর। সমাজ গঠনে, ধর্ম্মবিপ্লব সাধনে, বৈষম্য ভাব দূরীকরণে এবং শান্তি সংস্থাপনে নিত্যানন্দ বৈষ্ণবদলের অগ্রগণ্য তিনি পাপীদ্বয়ের উদ্ধার করিয়া নব-ধর্ম্ম প্রচারের পথ উন্মুক্ত, পরিষ্কৃত এবং প্রতিদ্বন্দ্বীশূন্য করিয়াছিলেন। অমানুষিক বলে বলীয়ান, আত্মসংযমে চিরভ্যস্ত উদ্দার ও দয়াশীল নিত্যানন্দ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক চৈতন্যের প্রধান বল; এবলের অভাবে চৈতন্যের অভীষ্ট পথে অগ্রসর হওয়া বোধ হয় দুষ্কর হইত। অভীষ্ট সাধনের দৃঢ়প্রতিজ্ঞার অভাব হইলে, মানসিক গতির পরিবর্ত্তনে লক্ষ্য বিচলিত হইলে, পরিণাম-

দর্শীতা না থাকিলে ধর্ম্মবীরগণ কখনই কোন দেশে সফল-কাম হইতে পারেন নাই। চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভৃতি মহাপুরুষগণ যেন কোন দেব-শক্তির অবিকৃত প্রতিমূর্ত্তি, যে কার্য্য সাধনোদ্দেশে ইঁহারা প্রেরিত, তৎসাধনোপযোগী বলের অভাব কখনও ইঁহাদিগের অনুভূত হয় নাই। উদ্দেশ্য সাধনে নিত্যানন্দের অবিচলিত যত্ন, অপূর্ব্ব ক্ষমাশীলতা, আত্মদুঃখ-বিস্মৃতি, স্থির নির্ভীকতা প্রভৃতি মহাপুরুষোচিত গুণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই ঘটনা উপলক্ষে বৈষ্ণবগণের মধ্যে সর্ব্বদা একটী গান গীত হইয়া থাকে। অনেকে বলেন এই গানটী তৎসাময়িক কোন ভক্তের রচিত, এ বিষয়ের কোন বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ না থাকিলেও স্বাভাবিক সরলতা, ও ভাবোচ্ছ্বাস শক্তির পরিচয়ের জন্য গানটী অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

"আয়রে আয় জগাই মাধাই আয়!
মেরেছ তার ভয় কি আছে আয়।
হরিসংকীর্ত্তনে নাচবি যদি আয়।
ওরে মার খেয়েছি না হয় আবার খাব,
ওরে তবু হরিনাম দিব আয়।
ওরে মেরেছে কলসীর কাণা, (মাধাই রে! ওরে মাধাই)
ওরে তাই বোলে কি প্রেম দিব না, আয়।
ওরে আমরা দুভাই গৌর নিতাই,

ওরে দুভায়ে তরাব দুভাই আয়।
তোদের স্নান করাব গঙ্গাজলে,
হরিনামের মালা দিব গলে আয়।
ওরে আয়রে মাধাই কাছে আয়,
হরিনামের বাতাস লাগুক গায় আয়।"

জগাই মাধাই চৈতন্যের শিষ্য হইল; অন্যান্য ভক্তগণের ন্যায় তাহারাও সংকীর্ত্তন করে, চৈতন্যের সেবা করে, ধর্ম্ম-প্রচারে সহায়তা করে। লোকে পূর্ব্ব সংস্কারানুসারে তাহা-দিগকে এখনও ভয় করিতে লাগিল; কিন্তু এখন তাহারা সর্ব্ব-দাই উদাসীন ভাবে পথে পথে বেড়াইয়া হরিনাম গান করে কাহারও কোন অনিষ্ট করে না। এইরূপে চৈতন্য ও নিত্যা-নন্দের নাম জন সাধারণে জানিতে পারিল; ধর্ম্মবীর চৈতন্যের জীবনের প্রথম দৃশ্য দেখা দিল।* বৈষ্ণবদল প্রকাশ্যরূপে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিল, সকলেরই মনে জগাই মাধাইয়ের উদ্ধার দেখিয়া চৈতন্যের শিষ্যগণের প্রতি ভক্তি জন্মিল। নির্ব্বি-বাদে প্রচার কার্য্য এবং প্রতি রজনীতেই শ্রীবাসে গৃহে সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল। ভক্তগণের কখন বা প্রেমাবেশে মূর্চ্ছা কখন বা বিকট চীৎকারে ভক্তির উচ্ছ্বাস প্রকাশিত হইত। একদা চৈতন্য শিষ্যগণকে একত্রিত করিয়া বলিলেন আজ আমি বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া নৃত্য ও সঙ্গীত করিব।

* চিরঞ্জীব শর্ম্মা প্রণীত ভক্তি চৈতন্য চন্দ্রিকা হইতে উদ্ধৃত।

গদাধরকে রুক্মিণী, নিত্যানন্দকে বড়াই, হরিদাসকে কোতোয়াল, শ্রীবাসকে নারদ ঋষি সাজিতে আদেশ করিলেন। সকলে সুসজ্জিত হইলে সঙ্গীত আরম্ভ হইল; প্রথমে মুকুন্দ সংকীর্ত্তন করিলেন তদনন্তর কোতোয়াল বেশে হরিদাস, নারদের বেশে শ্রীবাস, রুক্মিণী বেশে চৈতন্য; গোপিনী বেশে গদাধর ও ব্রহ্মানন্দ অভিনয় করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিলেন। চৈতন্যের পূর্ব্বে যে যাত্রা ছিল, এরূপ বোধ হয় না। প্রথমে সংকীর্ত্তন তারপর বিধিবদ্ধ সঙ্গীতের দল এবং ইহা হইতেই বর্ত্তমান কালে প্রচলিত যাত্রার উৎপত্তি হইয়াছে; ইঁহার সময়ে কৃষ্ণযাত্রার আন্দোলন ছিল পরে রামায়ণ ও মহাভারতের অংশ বিশেষ লইয়া নানাপ্রকার যাত্রার সৃষ্টি হয়। সে কালের এবং একালের সঙ্গীত রচনার মধ্যে অনেক বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট* হয়। সমালোচনা করিলে স্থির হয় যে পূর্ব্ব-কালীন সাধুগণের রচিত গানে হৃদয়োচ্ছ্বাসের অবিকৃত বিকাশ, স্বাভাবিক সরলতা, স্বতঃ স্ফুরিত শব্দবিন্যাস ও প্রার্থনার আন্তরিক গভীরতা ভাব স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। বর্ত্তমান শতাব্দীর বা তাহার কিছু পূর্ব্বের গানে এরূপ কিছুই দৃষ্ট হয় না; ক্রমে ক্রমে ভাবের বিকাশ অপেক্ষা শ্রুতিসুখকর শব্দ বিন্যাসের যত্ন বৃদ্ধি হইতেছে। কোন একজন ভক্ত চৈতন্যের যাত্রার উপ-

*১২৮৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারতীতে এবিষয় বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে।

কারিতা বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন করিয়া বলিয়াছেন সঙ্গীতের শক্তিতে পুরুষেরা পুরুষত্ব বিস্মৃত হইয়া প্রকৃতি ভাবাপন্ন হইলে নীচ প্রবৃত্তির হস্ত হইতে একেবারে নিষ্কৃতি লাভ করে। আমরাও বলি নিষ্কাম ভাবে ঈশ্বরোপাসনা করাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম-সাধন; ইহাই প্রেমের চরমাবস্থা, সঙ্গীতের শক্তি যে নিষ্কাম প্রবৃত্তির উত্তেজক তাহাও স্বীকার্য্য; কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় সঙ্গীতের শক্তি যেরূপ হইয়াছে উহা কেবল মনের নীচ প্রবৃত্তির পরিপোষক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশুদ্ধ সংগীত বিদ্যার চর্চ্চা নাই; কুরুচিপূর্ণ সাম্প্রদায়িক সংগীতে হিতে বিপরীত হইতেছে দেখিয়া ধার্ম্মিক মাত্রেই মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইতেছেন। কবে সেদিন আসিবে যে দিন ভক্ত বৈষ্ণবসন্তানদিগের মত বঙ্গবাসী নরনারী জীবনের প্রত্যেক সাধুবৃত্তি অনুশীলনকেই ধর্ম্মজীবনের সহকারী করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন! এখনও সেদিন আসে নাই—কিন্তু ঘনতিমিরাবৃত ভবিষ্যদাকাশের পূর্ব্বদিক বিদীর্ণ করিয়া যেন একটু আশার আলোকের আভাস দেখিতে পাইতেছি। ভগবান! তুমিই জান, তোমার দীন-হীন ভারতসন্তান কবে সে শুভদিনের মুখ দেখিবে!!

জগাই মাধাই পাপমুক্ত হইলে অদ্বৈতাচার্য্য হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠতর ইহাই প্রকাশ্য ভাবে শান্তিপুরে প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার এরূপ মত পরিবর্ত্তনের কোন অভ্রান্ত কারণ পাওয়া যায় না; বৈষ্ণবেরা

বলেন যে অদ্বৈতাচার্য্য দাস্য ভাবে চৈতন্যকে সেবা করিতে না পারিয়া এই নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন ; এই জন্যই বয়োবৃদ্ধ হইলেও তিনি পরে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য শান্তিপুরে গিয়া বাশিষ্ট শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া জ্ঞানের প্রাধান্য প্রচারে মত্ত হইলেন ; হরিদাস কোন কথাই বলেন না কেবল অদ্বৈতাচার্য্যের কথা শুনিয়া হাঁসিতে থাকেন। লোকে মনে করিল বৃদ্ধ অদ্বৈতের জ্ঞান লোপ পাইয়াছে ; তিনি আর ভক্তির মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন না, এই জন্যই ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠতর ইহাই প্রচার করিতেছেন।

আজ কয়েক বৎসর হইল একখানি পত্রিকাতে এ সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা আমরা এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম। "মনুষ্য কর্ত্তব্যের দুইটী বিভাগ আছে। একটী জ্ঞানের বিভাগ, আর একটী ভক্তির বিভাগ। এই জ্ঞান, শিক্ষা সমুদ্ভূত ; যাহাকে লোকে সাধারণতঃ বুদ্ধি বলে। বুদ্ধির বৃদ্ধ প্রপিতামহ মন, মনের কন্যা চিন্তা, চিন্তার কন্যা বুদ্ধি, বুদ্ধির সন্তান সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্ত হইতে বিশ্বাস, বিশ্বাস হইতে যত্ন, যত্ন হইতে কার্য্য। অপরদিকে ভক্তির বৃদ্ধ প্রপিতামহ হৃদয়, হৃদয় হইতে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা হইতে বিশ্বাস, বিশ্বাস হইতে ভক্তি, ভক্তি হইতে যত্ন ও যত্ন হইতে কার্য্য।

এক দিন চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ নগরে ভ্রমণ করিতে

করিতে বলিলেন চল আমরা একবার শান্তিপুরে গিয়া তত্রত্য শিষ্যগণকে দেখিয়া আসি; এই বলিয়া উভয়ে গঙ্গা পার হইয়া শান্তিপুরাভিমুখে চলিলেন। প্রচণ্ড সূর্য্যের তাপে ভক্তদ্বয় তৃষ্ণার্ত্ত ও পথশ্রান্ত হইয়া গঙ্গার তীরে এক সন্ন্যাসীর আলয়ে উপস্থিত হইলেন। চৈতন্য দেব সন্ন্যাসীকে দেখিবা মাত্রই প্রণাম করিলেন; সন্ন্যাসী সন্তুষ্ট চিত্তে তোমার ধন ও বিদ্যালাভ হউক এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন! চৈতন্যদেব বিস্মিত হইয়া সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন মহাশয় আমি এরূপ আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি না; ভগবানে মতি হউক আমি সর্ব্বদাই সজ্জনের নিকট এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া থাকি। সন্ন্যাসী দুঃখিত হইয়া বলিল হে দ্বিজ! কোথায় আমার আশীর্ব্বাদ সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ কবিবে; না আবার আমাকে নিন্দা করিতেছ! যে পৃথিবীতে বিলাস, সুখ, মান, ঐশ্বর্য্য ও কামিনীর সহবাস ভোগ করিতে না পারে তাহার জীবন বৃথা; বিষ্ণুভক্তিতে সংসারে আহার জুটিবে না, প্রাণ রক্ষা হইবে না, লোকের নিকট হইতে মানও পাইবে না। চৈতন্যদেব জগতে এমন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির লোকও আছে এই মনে করিয়া সন্ন্যাসীকে হাসিয়া বলিলেন পার্থিব ঐশ্বর্য্যে আমার কোন প্রয়োজন নাই; অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে, তথাপি আমার হৃদয়ের বিশ্বাস ভক্তিতেই লোকে মুক্তি পাইতে পারে। আমি ভক্তি কখনই ছাড়িতে প্রস্তুত নহি। এইরূপ কথোপকথন হইলে ভক্ত

দ্বয় সন্ন্যাসীর দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তথায় এক মুহূর্ত্তের জন্যও অপেক্ষা করিলেন না। পথে আসিয়া চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে সন্ন্যাসীর মনোগত ভাবের কথা জিজ্ঞাসা করি-লে নিত্যানন্দ বলিলেন সন্ন্যাসী আমাকে মদ্য পান করিতে অনুরোধ করিতেছিল ; ইনি শুধু মদ্যপায়ী নহেন, ইহাঁর কুটীরে সদা সর্ব্বদা একটী স্ত্রীলোকও বাস করে। চৈতন্য বিষ্ণু। বিষ্ণু। বলিয়া কাণে হাত দিলেন এবং নিত্যানন্দকে সন্ন্যাসীর কথা আর বলিতে বারণ কবিলেন। ভক্তদ্বয় অদ্বৈতাচার্য্যের ভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তিনি শিষ্যগণে বেষ্টিত হইয়া ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্টতর এই মর্ম্মে তর্ক ও মধ্যে মধ্যে যোগ বাশিষ্ট পাঠ করিতেছন। অদ্বৈতাচার্য্যের ব্যবহারে চৈতন্যের মন উত্তেজিত হইয়া উঠিল ; তিনি স্থির থাকিতে না পারিয়া সহসা আচার্য্যের সম্মুখে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি ? আচার্য্য বলিলেন জ্ঞানই সকল সময়ে শ্রেষ্ট, জ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত লোকে কখনই ভক্তি লাভ করিতে পারে না। চৈতন্য আর সহ্য করিতে পারিলেন না, আচার্য্যের গলদেশ ধারণ করিয়া প্রহার করিতে লাগিলেন। আচার্য্যও অম্লান বদনে "মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইল" বলিয়া সকল দুঃখ ভুলিয়া গেলেন এবং বিনীত ভাবে চৈতন্যের নিকট পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ভক্তির প্রতি কাহারও অনাস্থা দেখিলে চৈতন্য কোন মতে সহ্য করিতে পারিতেন

না ; তিনি সর্ব্বদাই মুখে বলিতেন ভক্তিহীনসংসারে বাস করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ ; তাঁহার হৃদয়ে কখন জ্ঞানের অভিমান স্থান পায় নাই, লোকে বিনীত হউক নির্জ্জীব পদার্থের ন্যায় সহিষ্ণু হউক ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। অদ্বৈতাচার্য্যের পুনঃপুনঃ ক্ষমা প্রার্থনায় চৈতন্য কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া বলিলেন তোমার বিনীত ভাব দেখিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি এবং তজ্জন্যই অঙ্গীকার করিতেছি যে তোমার অনুরোধে আমি শত অপরাধিকেও ক্ষমা করিব। সকলেই মনে করিয়াছিল যে চৈতন্য অদ্বৈতের প্রতি আন্তরিক অসন্তুষ্ট হইবেন ; কিন্তু চৈতন্যের প্রকৃতি সেরূপ ছিল না, শিষ্যগণের মধ্যে কাহাকেও অন্যায় কায করিতে দেখিলে তিনি রুষ্ট হইতেন বটে কিন্তু অপরাধীর ক্ষমা প্রার্থনায় তাঁহার হৃদয়ে আর সে ভাব থাকিত না। তিনি নিজে বিনীত ছিলেন এবং লোকের বিনয় দেখিলে আনন্দে অস্থির হইতেন। অদ্বৈতাচার্য্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলে চৈতন্য তাঁহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিলেন ; অন্যান্য ভক্তগণ চৈতন্যের উদারতার পরিচয় পাইয়া আনন্দে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

কীর্ত্তন শেষ হইলে অদ্বৈতাচার্য্য ভক্তগণকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। জাতিভেদে আহারের স্থান ভেদ দেখাইয়া বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন :—

"অদ্বৈতের হাতে ধরি নিত্যানন্দ সঙ্গে।
চলিল ভোজন গৃহে বিশ্বম্ভর রঙ্গে ॥

ভোজনে বসিয়া তিন প্রভু একঠাঁই।
বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ আচার্য্য গোঁসাই॥
দ্বারে বসি ভোজন করেন হরিদাস।
যার দেখিবার শক্তি সকল প্রকাশ॥"

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর অন্ন গ্রহণ কালে বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন:—

"একদিন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী স্থানে।
কৃপায়ে তাহার অন্ন মাগিলা আপনে॥
তোর অন্ন খাইতে আমার ইচ্ছা বড়।
কিছু ভয় না করিহ বলিলাম দৃঢ়॥
এই মত মহাপ্রভু বলে বার বার।
শুনি শুক্লাম্বর কাকু করেন অপার॥
ভিক্ষুক অধম মুই পাপীষ্ঠ গর্হিত।
তুমি ধর্ম্ম সনাতন মুই যে পতিত॥
* * * * * *
তথাপিহ শুক্লাম্বর ভয় পাই মনে।
যুক্তি জিজ্ঞাসিলেন সকল ভক্তগণে॥
সবে বলিলেন তুমি কেন কর ভয়।
পরমার্থে ঈশ্বরের কেহ ভিন্ন নয়॥
বিশেষ যে জন তাঁরে সর্ব্বভাবে ভজে।
সর্ব্বকাল তাঁর অন্ন আপনেই খোঁজে॥

দেখনা শূদ্রার পুত্র বিদুরের স্থানে।
অন্নমাগি খাইলেন স্বভাব কারণে॥
ভক্ত স্থানে মাগি খায় প্রভুর স্বভাব।
দেহ গিয়া তুমি বড় করি অনুরাগ॥

*　　*　　*　　*　　*　　*

স্নান করি শুক্লাম্বর অতি সাবধানে।
সুবাসিত জলে তৃপ্ত করিলা আপনে॥
তণ্ডুল সহিত তবে দিয়া গর্ভথোর।
আলগোছে দিয়া বিপ্র কৈল করযোড়॥

*　　*　　*　　*　　*　　*

সঙ্গে নিত্যানন্দ আদি আপ্ত কতজন।
ভিজা বস্ত্র এড়িলেন শ্রীশচী নন্দন॥
আপনে লইয়া অন্ন তান ইচ্ছা পালি।
শুক্লাম্বর দেখিয়া হাঁসেন কুতূহলী॥
হাঁসি বসিলেন প্রভু আনন্দ ভোজনে।
নয়ন ভরিয়া দেখে সব ভৃত্যগণে॥

ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত লেখকও চৈতন্যের জাতিভেদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি জাতিভেদ স্বীকার করিতেন কি না তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন; তবে বর্ত্তমান বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টি করিলে প্রতীতি হয় যে চৈতন্য জাতিগত বৈষম্যকে দূর করিতে যত্ন করিয়াছিলেন।

যবন হরিদাসকে তিনি স্বীয় শিষ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া জাতি-ভেদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। পুরাণেও লিখিত আছে :—

"চণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি পরায়ণঃ।
হরিভক্তি বিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥"

এই পুরাণোক্ত বচনে যে চৈতন্য সর্ব্বদাই জাগ্রত ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। ভক্ত চতুষ্টয় মহা আনন্দে শান্তিপুরে হরিনাম কীর্ত্তন ও প্রচার করিয়া আবার পূর্ব্বভাবে সকলে এক-ত্রিত হইয়া নবদ্বীপে হরিনাম কীর্ত্তন ও ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত হই-লেন।

ধর্ম্ম প্রচার করিতে করিতে চৈতন্যদেব একদিন দেবানন্দ পণ্ডিতের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। শান্তচিত্ত, জ্ঞানী, শুদ্ধ-স্বভাব, মোক্ষাভিলাষী, এবং আজন্ম উদাসীন দেবানন্দ পণ্ডিত সার্ব্বভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশারদের জাঙ্গালে বাস করিতেন; জনসমাজে একজন অদ্বিতীয় ভাগবতাধ্যাপক বলিয়া তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, তিনি সর্ব্বদাই ভাগবত পড়িতেন বটে কিন্তু তাহার মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারিতেন না কাজেই তাঁহার হৃদয়ে ভক্তি সঞ্চারিত হইত না। দেবানন্দ পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইয়া চৈতন্যদেব দেখিলেন যে তিনি অনন্য মনে ভাগবত পড়ি-তেছেন কিন্তু মুখের ভাবে স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে যে তিনি কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। চৈতন্য বলিলেন শ্লোকে

যাহা সাধনা করিয়া পায়না তুমি তাহা অবহেলা করিতেছ। এমন ভাবের গ্রন্থ তোমার হাতে পড়িয়া অনাদৃত হইতেছে দেখিয়া আমার হৃদয় দুঃখে শতধা বিদীর্ণ হইতেছে, লোকে তোমাকে জ্ঞানী বলিয়া প্রশংসা করে কিন্তু তুমি কোন গুণেই; সে প্রশংসার উপযুক্ত পাত্র নহ। দেবানন্দ চৈতন্যের কথা শুনিয়া অধোবদনে রহিলেন; নিতান্ত বিরক্ত ও দুঃখিত হইয়া কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া নীরবে নিজের অজ্ঞতার বিষয় ভাবিতে লাগিলেন; অনেক দিন এইরূপে কাটিয়া গেল, চৈতন্যের ভৎর্সনা তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল, অবশেষে নিতান্ত অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে চৈতন্য তাঁহাকে নিজের ভক্তশ্রেণী ভূক্ত করিলেন।

ক্রমে ক্রমে চৈতন্যের ধর্ম্মমত নবদ্বীপে ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে বিস্তৃত হইয়া পড়িল; ভক্তিতেই মুক্তি এই মূল-মন্ত্রে শত শত নরনারী দীক্ষিত হইল। যবনের রাজ্যে হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা; ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দী ধর্ম্মের প্রকাশ্য প্রচার, ইহা কাজির সহ্য হইল না। অসিতেই ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিস্তৃত "এক মাত্র ঈশ্বরের পূজা অপর সকল দেবপূজার প্রতিবাদ" ইস্‌লাম-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহম্মদের মূল-মন্ত্র; বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতি মুসলমানধর্ম্মের যে জাতহিংসা ইতিহাস ইহার জলন্ত সাক্ষ্য। একদিন কাজি ভ্রমণে বহির্গত হইয়া সংকীর্ত্তনের কোলাহল শুনিলেন; হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান সূচনায় কাজি ক্রোধে অন্ধ

হইয়া সদলে সংকীর্ত্তনস্থানে প্রবেশ করিলেন; সমাগত ও সংকীর্ত্তনমত্ত ভক্তগণ সশঙ্কিত ও পলায়নপর হইল। কাজি যথেচ্ছক্রমে কাহারও প্রহার, কাহারও পদদলন, কাহারও বা পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া সংকীর্ত্তনের দলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তুলিল। বাদ্যযন্ত্রাদি যেথানে ছিল সেথানেই রহিল কেহই প্রাণভয়ে তাহা স্থানান্তরিত করিতে পারিল না। যবনে শরীর স্পর্শ করিবে; যবনের ধর্ম্মের হুঙ্কার শুনিতে হইবে এই মনে করিয়া সকলেই শ্রবণরন্ধ্র নিরুদ্ধ করিয়া পলায়ন করিল। কাজি বাদ্য-যন্ত্রাদি চূর্ণ করিয়া চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল; ইস্‌লাম ধর্ম্মের হুঙ্কারে নবদ্বীপ বিকম্পিত হইল! গ্রামে কাজি আসিয়া অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে ইহা পাড়ায় পাড়ায় প্রচার হইয়া গেল; সকলেই নিজ নিজ প্রাণ, মান, ধন নিরাপদ করিতে ব্যস্ত। শাক্তগণ মনে করিল এই বারে চৈতন্যের ধর্ম্ম বিনষ্ট হইবে নবধর্ম্মের নেতাগণ বন্দী হইয়া নবাবের নিকট প্রেরিত হইবে, তথায় তাহারা রাজদ্রোহী বলিয়া নিশ্চয়ই প্রাণ হারাইবে। এই সকল অনিশ্চিত ঘটনার আন্দোলনে ঘরে ঘরে জনতা হইতে লাগিল, কেহ কেহ বা গোপনে চৈতন্যকে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পরামর্শ দিল। ধর্ম্মবীর চৈতন্য সংকীর্ত্তনস্থানে উপস্থিত ছিলেন না; নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য্য, হরিদাস, পুণ্ডরিক প্রভৃতি মাহাত্মাগণও তখন কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত ছিলেন; কাজেই সংকীর্ত্তনস্থানে কাজির

প্রতিদ্বন্দী বা দলের অধিনায়ক স্বরূপ কেহই ছিল না। কাজির অত্যাচারের কথা গোপনে থাকিল না; চৈতন্য এ সংবাদ পাইয়া ক্রোধে অধীর হইলেন। ভক্তের অবমাননা ভক্তের হৃদয়ে সহ্য হয় না, স্বীয় শিষ্যগণ বিজাতীয় কর্ত্তৃক যথেচ্ছ উৎপীড়িত হইয়াছে; এ অবমাননা চৈতন্য সহ্য করিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ দলের অধিনায়কদিগকে আহ্বান করিয়া সক্রোধে বলিলেন ম্লেচ্ছ কর্ত্তৃক পবিত্র ধর্ম্ম কলঙ্কিত ও বৈষ্ণবগণ ভয়ে ভীত হইয়াছে, চতুর্দ্দিকে আমাদের দুর্ব্বলতার আন্দোলন হইতেছে, আমরা কয়েক জন জীবিত থাকিতে আমাদের শিষ্যগণ কৃতাবমাননার প্রতিহিংসায় বিরত থাকিবে ইহা নিতান্ত ভীরুর কথা, অতএব আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে নবদ্বীপের ঘরে ঘরে এই বার্ত্তা ঘোষণা কর যে আমি অদ্য অপরাহ্নে সদলে কাজির কৃতাপরাধের যথোচিত শাস্তি বিধান করিব; তোমরা সকলেই উৎসাহে এ বিষয়ে যত্নবান হও এবং আমার প্রিয় শিষ্যগণের মধ্যে আমার ইচ্ছা প্রচার কর। শিষ্যগণের প্রতি অযথোচিত ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া চৈতন্যের মুখ হইতে এই সকল আদেশ শুনিয়া উপস্থিত ভক্তগণ উৎসাহিত হইয়া উঠিল, সকলেই আগ্রহ সহকারে চৈতন্যের মুখের দিকে অনিমিষ নয়নে চাহিয়া রহিল। চৈতন্যের আদেশ মুহূর্ত্ত সময়ের মধ্যেই নবদ্বীপময় হইল; নবদ্বীপবাসিগণ সোৎসুক অন্তঃকরণে অপরাহ্নের প্রতীক্ষা করিতে

লাগিল ; স্ত্রী, পুরুষ, বৃদ্ধ, যুবা, ধনী, নির্ধন সকলের হৃদয়ই উৎসাহ পূর্ণ ; বৈষ্ণবদলে মহা আন্দোলন চলিতে লাগিল। চৈতন্যের আদেশ অলঙ্ঘ্য, ধর্ম্মবীরের বল অপ্রতিহত, নব প্রতিষ্ঠিত সমাজের নেতার মানসিক বল ও উৎসাহ দুর্দ্দমনীয় এই সকল বিবেচনা করিয়া কাহারও হৃদয় স্থির রহিল না। ধর্ম্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে ইহা অপেক্ষা ধার্ম্মিকের আর অন্য কি অনুষ্ঠান আছে? বৈষ্ণব সমাজ নব বলে বলীয়ান, ঐশী শক্তিতে সুদৃঢ়, অধিনায়কগণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় অটল। চৈতন্যের মনোগত ইচ্ছা জানিবা মাত্র গদাধর, বক্রেশ্বর, মুরারি, শ্রীবাস, গোপীনাথ, জগদীশ, গঙ্গাদাস, মুকুন্দ শ্রীধর প্রভৃতি ভক্তগণ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন ; সংকীর্ত্তনের আয়োজন হইতে লাগিল ; সকলেই আগ্রহাতিশয়ে সূর্য্যাস্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন , বৈষ্ণবগণের প্রমত্ততায় দিবা অবসান হইয়া আসিল , ঘোষিত সময় আসন্ন দেখিয়া ভক্তগণ মহা আনন্দে চৈতন্যের আলয়ে উপস্থিত হইলেন , চৈতন্য সকলকে সমাগত ও উৎসাহিত দেখিয়া দলের নেতৃগণকে বলিলেন আজ দলে দলে বিভক্ত হইয়া সংকীর্ত্তন করিতে হইবে , অদ্বৈতাচার্য্য, হরিদাস ও শ্রীবাস তিন দলের নেতা হইয়া নাম কীর্ত্তন করিবেন ; সকলের শেষে আমি ও নিত্যানন্দ সংকীর্ত্তন করিব এইরূপ স্থির হইলে, বৈষ্ণবগণ সমস্বরে হরিবোল দিয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন ; চতুর্দ্দিক হইতে হাততালি, মৃদঙ্গ

মন্দিরা করতাল ও শঙ্খের ধ্বনিতে সমগ্র নবদ্বীপ কাঁপিয়া উঠিল; সকলেই হরিবোল দিতে লাগিল, নবদ্বীপে এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের সৃষ্টি হইল। প্রতি দ্বারে ফল সমন্বিত কদলী বৃক্ষ প্রোথিত, পূর্ণঘট সংস্থাপিত, মঙ্গলাচরণের মঙ্গল সূচক ধ্বনিতে নবদ্বীপে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। তৎকালিন মঙ্গল সূচক আচার কিরূপে নির্ব্বাহিত হইত তাহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত হইল :—

"কান্দির সহিত কলা সকল দুয়ারে।
পূর্ণ ঘট শোভে নারিকেল আম্রসারে॥
ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে পরম সুন্দর।
দধি দুর্ব্বা ধান্য দিব্য বাটার উপর॥
হইল সকল পথ পট কড়ি ময়।
কেবা করে কেবা পেলে হেন রঙ্গ হয়॥"

এইরূপে মহানন্দে ভক্তগণ সংকীর্ত্তনে প্রমত্ত হইয়া উঠি-লেন; নবদ্বীপের দ্বারে দ্বারে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া চৈতন্য-দেব গঙ্গাতীরে মাধাইয়ের ঘাটে উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মদীক্ষার পর মাধাই এই ঘাটে সর্ব্বদা বাস করিতেন বলিয়া তন্নামে ঘাটের নাম হইয়াছে; লোকেও পবিত্রতার জন্য সর্ব্বদাই এই ঘাটে স্নান করিত। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে; সুরধুনী অবিশ্রান্ত বেগে ও কুল কুল রবে সাগরাভিমুখী হইয়া দৌড়ি-

তেছে; সন্ধ্যা সমীরণ শ্রান্তদেহ সুশীতল করিয়া পবিত্রতা সাধন করিতেছে; ভাগিরথীবক্ষে ভাসমান তরীতে দুই একটী দীপ জ্বলিতেছে; প্রকৃতির এই মনোহর শোভা সন্দর্শন করিয়া বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে ভক্তির দুর্দ্দম উচ্ছ্বাস উঠিল। প্রেমিক মাত্রেই ভাবুক, কাজেই চৈতন্য ও তৎসহচরগণ স্থির থাকিতে পারিলেন না, হৃদয়ের গভীর আবরণ উন্মুক্ত করিয়া, ধর্ম্মভাবে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অভীষ্ট সাধনে বিলম্ব হইতেছে মনে করিয়া চৈতন্যদেব শিষ্যগণকে কাজির আলয়াভিমুখ হইতে আদেশ করিলেন; চৈতন্যের আদেশ মাত্রেই ভক্তগণ সিমলিয়া গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বিধর্ম্মীর অত্যাচার দমনে সকলেই বদ্ধ পরিকর, ধর্ম্মবলে সকলের হৃদয়েই অমিত তেজ সঞ্চিত, সকলেই এক উদ্দেশ্যে, এক নেতার অধীনে প্রধাবিত ও চালিত, ধর্ম্মযুদ্ধে আজ ভক্তগণ অগ্রপদ, নির্ভীক ও দুর্দ্দান্ত। সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তগণ কাজির আলয়ের সম্মুখীন হইয়া, চৈতন্যের আদেশ অপেক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। শিষ্যগণের আগ্রহ বুঝিতে পারিয়া চৈতন্য আর অপেক্ষা করিলেন না কাজির বাটী চূর্ণ করিতে আদেশ দিলেন। শিষ্যগণ আদিষ্ট হইবা মাত্রই কাজির বাটী, উদ্যান, মসজিদ সকল চূর্ণ করিয়া ফেলিল। কেহ আর কাহারও মুখের দিকে চাহে না সকলেই একমনে কাজির অনিষ্ট সাধনেক্ষিপ্রহস্ত; কাজি পূর্ব্বেই

চৈতন্যের আগমন বার্ত্তা পাইয়াছিল। বাটী ও মস্‌জিদ ভূমিসাৎ এবং উদ্যান নিবৃক্ষ হইলে চৈতন্য নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কাজির বাটী ভস্মীভূত করিতে আদেশ করিলেন। অন্যান্য ভক্তগণ সদ্য বিপদাশঙ্কা করিয়া গলবস্ত্রে ক্রোধ নিবৃত্তির প্রার্থনা করিল এবং শান্ত হইবার জন্য অনেক প্রকার অনুনয় করিল। শিষ্যগণের আন্তরিক অনুরোধে চৈতন্যদেব শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিলেন; পরিশেষে সকলে একত্রিত হইয়া সংকীর্ত্তন করিতে-করিতে নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিলেন। গ্রামে গ্রামে মহা আন্দোলন পড়িয়া গেল; চৈতন্যদেব ধর্ম্মশত্রু পরাজিত করিয়াছেন, একথা আর গোপনে রহিল না, কেহই আর ভক্তদলের বিরুদ্ধবাদী হইতে সাহসী হয় না। অধিকতর উৎসাহে ও কৃতকার্য্যতার সহিত ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ হইল; শ্রীমদ্ভাগবতের গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মভাব বদ্ধমূল ও জাতীয় একপ্রাণতা অটল হইল। ধর্ম্মসূত্রে জাতীয় একতা, সহানুভূতিও সদ্ব্যবহারিতা যেমন স্থির ও অটল তেমন আর কিছুতেই হইতে পারে না। জগতের অবনতিতে বিশ্বনিয়ন্তার পবিত্র সিংহাসনে আঘাত লাগে, এই অবনতি নিরাকরণ করিবার জন্যই চৈতন্যের অবতারণা। সকলদেশেই ধর্ম্ম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে; সত্যের জয় সকল দেশেই বিখ্যাত; চৈতন্যদেব যে উদ্দেশ্যে ধর্ম্ম সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার ক্ষমতা আজ পর্য্যন্তও অনেক দেশে অবিকৃত রহিয়াছে। চৈতন্যের হৃদয়ে

যে বিশ্বাসের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও পরিণতি হইয়াছিল ধর্ম্মজগতে তিনি অক্ষুণ্ণ চিত্তে তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন রাখিয়াছেন। সৌভাগ্য ক্রমে উপযুক্ত সহচর পাইয়াছিলেন নতুবা তাঁহার শক্তি তাঁহার সঙ্গেই বিলীন হইয়া যাইত, এজগতে তাঁহার শক্তি আদৃত এবং কীর্ত্তিত হইত না। প্রেম অবাতরে বিতরণ করি-বেন চৈতন্যের এ ইচ্ছা সফল হইল, ধনী নির্ধন, স্ত্রী পুরুষ, জ্ঞানী মূর্খ, বালক বৃদ্ধ সকলকেই তিনি অকপট হৃদয়ে প্রেম শিক্ষা দিয়াছিলেন। চৈতন্যের জীবন এইরূপে পরিণত হইতে লাগিল। তিনি আর এখন প্রতিবাসীগণের প্রতি অত্যাচার, বৃথা তর্কে বাক্যব্যয় করেন না, কেবল একমাত্র ঐশ্বরিক চিন্তায়, ধর্ম্ম প্রচারে ও ধর্ম্মের আলোচনায় তাঁহার মন সর্ব্বদাই নিমগ্ন। সংসারের সুখ আর তাঁহার প্রার্থনীয় নহে; পরিবার, সম্পত্তি, বিলাস ভোগ, মায়া প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বী রিপু আর তাঁহার হৃদয়কে প্রলুব্ধ করিতে পারে না; তিনি স্থিরচিত্ত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং ঐকান্তিক প্রেমবশ হইয়াছেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে তিনি আত্মজ্ঞান হারাইতেন, ধর্ম্মের কথা বলিতে বলিতে প্রেমের গভীর উচ্ছাসে রুদ্ধকণ্ঠ হইতেন। চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম-জীবন অনেক দিন হইতেই অটল ভিত্তির উপরি সংস্থাপিত হইয়াছিল, কেবল উহা বহুদর্শিতায় পরিণত হইবার বাকী ছিল।

এই সময়ে একদিন চৈতন্যদেব সশিষ্যে শ্রীবাস পণ্ডিতের আলয়ে সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন; সকলেই বাহ্যজ্ঞান শূন্য

হইয়া ভাবে প্রমত্ত হইয়াছেন, এমন সময়ে শ্রীবাসের অন্তঃপুর হইতে নারীগণের রোদনের রব উত্থিত হইল, রোগ-প্রপীড়িত শ্রীবাস পণ্ডিতের পুত্রের মৃত্যুই এই রোদনের কারণ। শ্রীবাস সশঙ্কিত চিত্তে বাটীর মধ্যে আসিয়া দেখিলেন পুত্রের প্রাণ-বায়ু রহিত হইয়াছে, দেহ নিস্পন্দ ভাবে ভূপতিত; তিনি শোকে বিহ্বল না হইয়া পরিবারবর্গকে যথোচিত সান্ত্বনা করিলেন। শবস্থানে আর অপেক্ষা না করিয়া সংকীর্ত্তন স্থানে আসিয়া পূর্ব্বমত সংকীর্ত্তনে মাতিলেন। চৈতন্যদেব অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া সকলকেই রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; প্রকৃত কারণ আর গোপনে রহিল না। সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া চৈতন্য দুঃখিতভাবে শ্রীবাসকে পুত্রের মৃত্যু সংবাদ না বলিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত স্মিত মুখে প্রত্যুত্তরে বলিলেন পাছে আমাদিগের উদ্দীপ্ত ভাবের ব্যাঘাত জন্মে এই ভয়ে আমি এই দুর্দ্দৈব ঘটনার কথা প্রকাশ করি নাই। চৈতন্য প্রথমে বিস্মিত পরে হৃষ্টচিত্তে শ্রীবাসকে আলিঙ্গন করিলেন; পুত্রবিরহে শ্রীবাস ব্যথিত হৃদয় হইয়াছেন মনে করিয়া বলিলেন; পণ্ডিত! মৃত্যুই লোকের অপরিহার্য্য এবং শেষ গতি; যে মরে সে সংসারের কষ্ট হইতে রক্ষা পায়; এজগতে ধর্ম্মের প্রতিরোধী অনেক প্রলোভন ও বিপত্তি আছে, তোমার পুত্র এ সকল কিছুই ভোগ করিতে পারে নাই; তুমি ইহার জন্য দুঃখিত হইও না। সকলেই কোন

না কোন সময়ে মরিবে ইহা বিশ্বনিয়ন্তার আদেশ, এ আদেশ অতিক্রম করিতে কাহারও সাধ্য নাই। এই সকল কথা বলিতে বলিতে চৈতন্যের কণ্ঠরোধ হইল, চক্ষুদ্বয় হইতে দর দর ধারে অশ্রু পড়িতে লাগিল, বাহুদ্বয় দ্বারা শ্রীবাসকে বেষ্টন করিয়া রহিলেন। এইরূপে কিছুক্ষণ থাকিয়া চৈতন্য যেন চেতনা পাইলেন, আর অপেক্ষা না করিয়া বলিলেন শিষ্যগণ! চল আমরা সকলেই পণ্ডিতের পুত্রের সৎকারে যোগ দান করি। এই বলিয়া চৈতন্য সদলে বাটীর মধ্যে আসিলেন; সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শব লইয়া ভক্তগণ গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। যথাবিধি মৃতশিশুর সৎকার করিয়া ভক্তগণ গৃহে প্রত্যাগত হইলেন; তৎকালে কিরূপ বিধি অনুসারে এই ক্রিয়া সম্পন্ন হইত কোন গ্রন্থে তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তৎকালীন সমাজের রীতি নীতি উদ্ধার করা দুরূহ কার্য্য; চৈতন্যের জীবনী সম্বন্ধে যে সকল প্রাচীন গ্রন্থাদি পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশই কবিকল্পিত ও এত রঞ্জিত যে তাহা হইতে সত্য নির্দ্দেশ করা অসাধ্য ব্যাপার। অবতার বাদীরা ঘটনাবলীকে লীলা শ্রেণীভুক্ত করিয়া ঐতিহাসিক চিত্রগুলি কল্পনাসম্ভূত করিয়াছেন; তবে কল্পনা আংশিক বা সম্পূর্ণ সত্যের ভিত্তির উপর স্থাপিত। লোকে যাহা কখন দেখে নাই শুনে নাই বা জানে নাই তাহা কল্পনার সীমা বহির্ভূত, বর্ণিত বিষয় দেখিলে তৎসদৃশ আর একটী বিষয়

স্বতঃই মনে উপস্থিত হয়। এই জন্যই পণ্ডিতেরা সংস্কারকে ত্রিবিধ বিভাগ করিয়াছেন, দৃষ্টি, শ্রুতি ও অনুভব সংস্কার। কবির কল্পনা এ সীমা অতিক্রম করিতে পারে না তবে অতি রঞ্জিত বা অরঞ্জিত দোষে কোন স্থলে সত্য বিলুপ্ত এবং কোন স্থলে বা সত্য উদ্ঘাত হয় না, প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে অনেকেরই এ দোষ ছিল কাজেই প্রকৃত প্রাচীন ঘটনা দুর্লভ হইয়াছে। চৈতন্যের জীবন তিনভাগে বিভক্ত করিয়া প্রাচীন কবিগণ আদি মধ্য ও অন্ত লীলা নাম দিয়াছেন, অবতার হইলে লীলা করিতে হইবে ইহা এক প্রকার সিদ্ধান্ত। বর্ত্তমান শতাব্দীর পাঠকগণ লীলা শব্দে কুরুচিপূর্ণ ঘটনাবলীর কথা মনে করেন প্রকৃত পক্ষে অনেক স্থলে উহা যথার্থ নহে, চৈতন্যের জীবনী ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত। যদিও চৈতন্যভাগবত প্রণেতা বৃন্দাবন দাস চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যমঙ্গলের লেখকগণ প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করিতে করিতে ভাবের উচ্ছ্বাসে সত্যের জ্যোতিঃ আঁধারে নিহিত করিয়াছেন, তথাপি অনুসন্ধিৎসু হইয়া তৎসমুদয় গ্রন্থাদি পাঠ করিলে অনেক তত্ত্ব উদ্ধৃত হইতে পারে। চৈতন্যের সময়ে প্রকৃত ইতিহাসবেত্তাগণের জন্ম হওয়া দূরে থাকুক অধিকাংশ লোক বর্ণ অক্ষর পারগ হইয়াছিল না, তখন বর্ণভেদে অধ্যয়ন ও অধ্যাপন কার্য্য সম্প্রদায় গত ছিল, চৈতন্য এ বৈষম্যের নিবারণে প্রভূত যত্ন করিয়াছিলেন এবং অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। তৎকালঘটিত ঘটনা-

বলী লোকের মুখে মুখে চলিত কাজেই লোকে তখন গল্প করিতে ও শুনিতে ভাল বাসিত। আজ পর্য্যন্তও প্রাচীন লোকের নিকট বসিলে অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়; সে সময়ে ইতিহাস লিখিবার প্রথা ছিল না, মুখে মুখে ইতিহাস চলিত এবং বক্তাগণের রুচি অনুসারে ঘটনাবলীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বৰ্দ্ধিত হইয়া মূল কথা অনেক নীচে পড়িয়া যাইত; প্রকৃত ঘটনা হয়ত উল্লেখ করিতে অনেকে বিস্মৃত হইতেন। এইরূপ নানা কারণে প্রাচীন বীরগণের জীবন প্রচার করা বর্ত্তমান সমাজের দুঃসাধ্য হইয়াছে। আজ কাল কীটদষ্ট পুঁথির উদ্ধার সাধনে বর্ত্তমান সাহিত্যসমাজ যেরূপ যত্নপর হইয়াছেন তাহাতে আমরা অচিরাৎ বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি আশা করিতে পারি। বিলুপ্ত গৌরব ও কীর্ত্তি যতই প্রচারিত হইবে জাতীয় এক প্রাণতার মূল ততই দৃঢ় হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়।

কীর্ত্তিত মহাপুরুষগণের জীবন আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় লোকে যাহা সামান্য মনে করিয়া তুচ্ছ করে মহাপুরুষগণ তাহাতে অসীম ভাব লুকায়িত দেখেন; এই অসীম ভাবেই তাঁহারা মত্ত ও আত্মবিস্মৃত। ভাবুকের মন

যে দিকে যাহা দেখে তাহাই ভাবিতে ভাবিতে আত্মজ্ঞান হারাইয়া অভিমানের মূল-সূত্র ভুলিয়া যায়; ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষগণও আকাশতলে দাঁড়াইয়া বিশ্বস্রষ্টার অতুল, অসীম ও পূর্ণ কৌশলের পরিচায়ক প্রকৃতির মনোহর সৌন্দর্য্য দেখিয়া আত্মহারা হয়েন। প্রতিদিন যাহা ঘটিতেছে তাহা হইতে মহৎ জীবনের সূক্ষ্মগতি স্থির হইতেছে। মহাপুরুষ যাহা দেখেন তাহাতেই চিন্তাবিহ্বল, তাহাই তাঁহার নিকট অচিন্ত্য ও অনন্তভাবপূর্ণ, সহস্রবার দেখিলেও তাহার নূতনত্ব তাঁহার নিকট শেষ হয় না। প্রেমিকের হৃদয়ে প্রেমের সীমা নাই; অসীমতা উপলব্ধি না হইলে সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র হৃদয়ে প্রেমের স্থান হইতে পারে না; প্রেম বিশ্বব্যাপী, সংকীর্ণস্থান ব্যাপী নহে; হৃদয় সংকীর্ণ হইলে বিশ্বব্যাপী প্রেম সে হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে না। প্রেমে প্রেমিকের হৃদয় বিচলিত হয়; প্রভাত সমীরণের সুমন্দ হিল্লোল, বসন্ত কুসুমের ঈষদুন্মুক্ত আভা, শারদ গগণের চন্দ্রতারকার বিমল রশ্মি, নদীবক্ষে তরঙ্গায়িত সলিল প্রবাহ—কত বলিব, প্রকৃতি বক্ষের ক্ষুদ্র হইতে মহান্ সকল ঘটনাতে তোমার আমার পাষাণ মন টলিয়াও টলে না, বুঝিয়াও বুঝে না—কিন্তু অতুল প্রেমের আধার ভক্তের হৃদয় গলিয়া যায়; বিশ্বনিয়ন্তার ক্ষুদ্র হইতে মহান্ প্রত্যেক কার্য্যের গম্ভীর অতলস্পর্শভাবসমুদ্রে তাঁহারা আত্মহারা হইয়া ডুবিয়া পড়েন। তুমি আমি সংসারের দাস, স্বার্থের প্রীতিপুত্তল, অহঙ্কারের

জীবন্ত মূর্ত্তি। গভীর অতলস্পর্শ সমুদ্রগর্ভে আমাদের উদ্ধত গর্ব্বিত মস্তকচূড়া ডুবিতে চায় না; কিন্তু ঐ দেখ ভক্ত তোমার আমার পদদলিত তুচ্ছ বালুকাকণার ভাবসমুদ্রে সমস্ত জগতের সঙ্গে আপনাকেও ডুবাইয়া রাখিয়াছেন!! ভক্ত যাহা দেখেন তাহাতেই ভক্তির প্রতিবিম্ব দিব্যচক্ষে দেখিতে পান; ভক্তের হৃদয় হইতে ভক্তি উদ্ভাসিত এবং দৃষ্টবস্তু হইতে ভক্তের হৃদয়ে ভক্তি সঞ্চারিত হয়। চৈতন্যদেবের হৃদয় উন্নত, অমায়িক, স্বার্থশূন্য ও বিশ্বাসে অবিচলিত; জগৎ তাঁহার তিনিও জগতের, জাতিগৌরব ধন, মান এ সকল কিছুই তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত নহে; জগতকেও তিনি এ সকল বিষয়ে আকাঙ্ক্ষী দেখিতে ইচ্ছুক নহেন। ধর্ম্মে সকলের সমান অধিকার এই স্বর্গীয় সাম্যনীতির পূর্ণ প্রচার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য; তাঁহার বিশ্বাস যে ধর্ম্মজগতের অবনতি ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে; কেবল স্বার্থপর মানুষ স্বেচ্ছাচারে ধর্ম্ম অধর্ম্মে পরিণত করে, স্বর্গ নরকের বীভৎস দৃশ্যে পূর্ণ করিয়া অধর্ম্মের স্রোতে খেলা করিতে থাকে পরিণামে প্রবল ঝটিকায় সকলই ফুরাইয়া যায়। ধনী নির্ধন, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, মহৎ নীচ সকলকেই প্রেমশিক্ষা দিবেন ইহাই চৈতন্যদেবের ব্রত; সংসারে নিবিষ্ট থাকিয়া ইচ্ছানুরূপ এ ব্রত সাধন হইতে পারে না ইহা তাঁহার ধারণা ছিল। সংসারের প্রলোভন হইতে দূরে থাকিবার জন্য তিনি সংসার ত্যাগ করেন নাই, তিনি কেবল দেশ দেশান্তরে হরিনাম প্রচার করিবার জন্যই

সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তাঁহার প্রাণ অভক্তির দৃশ্যে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে তিনি পথ না দেখাইলে লোকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে যাইবে না। এই সকল কারণেই তিনি সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন: অনেক দিন হইতে তাঁহার বিষয়ে বিরাগ জন্মিয়াছিল কেবল সুযোগাভাবেই তিনি সংসারাশ্রমে ব্যথিত হৃদয়ে দিন কাটাইতেছিলেন। শিথিল ও বিচ্ছিন্নমূল সমাজের রক্ষার জন্যই মহাপুরুষগণের আত্মত্যাগস্বীকার করিতে হয় এবং এই জন্যই ধর্ম্মরাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইলেও উহা একেবারে ধ্বংস হয় না।

অতি সামান্ত ঘটনায় চৈতন্যদেবের সংসারত্যাগের লক্ষিত ইচ্ছা উদ্রিক্ত হয়। যিনি ধর্ম্মের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহার চিত্তবিকার, সংসারে বিরক্তি ভোগ নিস্পৃহতা কেমন করিয়া জন্মিল? যাঁহার সংসারে সকলই আছে তিনি কি নাই বলিয়া দেশান্তরে যাইবেন ইহা সকলের মনেই উদিত হইতে পারে। ভক্তের মন কি চায় তাহা কে বলিতে পারে? ঈশ্বরের অনন্ত প্রেমে যিনি মুগ্ধ তাঁহার প্রেম অনন্ত ও অপূর্ণ; তিনি চঞ্চল, হতাশ, আকাঙ্ক্ষী; অনন্তকে ভাবিতে ভাবিতে যিনি আত্মহারা হইয়া অনন্তে মিশিয়া যান, তাঁহার অস্তিত্বজ্ঞান নাই, অভিমান নাই, ঐশ্বর্য্য নাই; প্রকৃতির ঐশ্বর্য্যে যিনি ধনী, অনন্ত প্রেমে যিনি প্রেমিক, স্বার্থহীন হৃদয়ে যিনি জগতকে আপন মনে করেন

তাঁহার ন্যায় সুখীই বা কে দুঃখীই বা কে? বুঝিতে গিয়া বুঝিলেন না, ধরিতে গিয়া পাইলেন না, ভাবিতে গিয়া মীমাংসা হইল না তাঁহার হৃদয় কি প্রকারে স্থির থাকিবে? তিনি শান্তির আধার হইয়াও শান্তির অভাব মনে করেন, ধনী হইয়াও ধন চাহেন, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ভাবিতে ভাবিতে অতৃপ্ত হয়েন। চৈতন্যদেবের তাঁহাই হইয়াছিল, তিনি যে এ জগতে কোন একটী কাযের জন্য প্রেরিত হইয়াছেন তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু কি কায করিতে হইবে তাহা এ পর্য্যন্ত ঠিক বুঝিতে পারেন নাই; কেহ তাঁহাকে এ বিষয় বলিয়া দেয় নাই। তিনি আঁধারে খুঁজিতে ছিলেন তাঁহার জন্য কি কার্য্য অসম্পূর্ণ বা অকৃত রহিয়াছে; খুঁজিতে খুঁজিতে, ভাবিতে ভাবিতে বুঝিলেন ধর্ম্মজগতে তাঁহার একটী কায আছে, সে কায সংসারে থাকিয়া সিদ্ধ হইবে না, আত্মীয় পরিজনে বেষ্টিত থাকিয়া সে কায হইবে না, স্বার্থে অন্ধ হইয়া সে কায করিবার পথ পাইব না, সংসার ত্যাগ, স্বার্থবিসর্জ্জন ও সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইবে। একদিন চৈতন্যদেব ভাবোন্মত্ত হইয়া শিষ্যগণ মধ্যে নৃত্য করিতেছেন এবং মুখে ঘন ঘন গোপীর নাম করিতেছেন; এমন সময়ে উপস্থিত শিষ্যগণের মধ্যে একজন পড়ুয়া নিতান্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ঐ নাম ত্যাগ করিতে বলিলেন। তিনি এইরূপ ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া উপদেষ্টার প্রতি প্রহারোদ্যত

হইলেন। পড়ুয়া তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া প্রাণভয়ে সংকীর্ত্তনস্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল; তিনি তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া পড়ুয়ায় পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন কিন্তু ধরিতে পারিলেন না, অভীষ্ট সাধনে বিফল হইয়া স্ব স্থানে প্রত্যাগত হইলেন। পড়ুয়া আলয়ে আসিয়া সমবয়স্কগণের নিকট সমস্ত বিবরণ আদ্যোপান্ত বলিল, সকলেই চৈতন্যের এইরূপ ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া গোপনে তাঁহাকে প্রহার করিবার ষড়যন্ত্র করিল। ক্রমে ক্রমে এই কথা চৈতন্য শুনিতে পাইলেন; একদিন শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া নীরবে বসিয়া আছেন, সহসা বলিয়া উঠিলেন :—

"করিল পিপলিখণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আর কফ্ বাড়িল দেহেতে॥"

কেহই ইহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত ভাবে চৈতন্যের মুখ পানে চাহিয়া রহিল; তিনিও আর কোন কথা না বলিয়া ঈষৎ হাসিতে লাগিলেন। শিষ্যগণের মধ্যে মহাতর্কের সূত্রপাত হইল; কিছুতেই উচ্চারিত কথার মর্ম্মভেদ হয় না এবং কেহই তাঁহাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে অগ্রসর হয় না। পরস্পরের মুখের দিকে সকলেই একদৃষ্টে রহিল। চৈতন্যের মূর্ত্তি গম্ভীরতর হইয়া আসিল; আর তাঁহার মুখে হাসি লক্ষিত হয় না; স্থির মনে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির সুযোগ কল্পনা করিতে লাগিলেন। উপস্থিত শিষ্যগণের মধ্যে মহা ভয় জন্মিল, কেহ

কেহ বা পূর্ব্ব ঘটনা উল্লেখ করিয়া চৈতন্যের মনোগত ভাবের ব্যাখ্যা করিতে লাগিল ; প্রকৃত অর্থ কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

কেবল মাত্র নিত্যানন্দ চৈতন্যের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, চৈতন্য অসন্তুষ্ট হইবেন ভয়ে তিনি কাহারও নিকট নিজের কথাও প্রকাশ করিলেন না। নিত্যানন্দের বিষণ্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া শিষ্যগণের কৌতূহল বলবতী হইল; কাহাকে প্রকৃত তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিবে, এই ভাবিয়া শিষ্যগণ আন্তরিক ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল। এইরূপে কিছু ক্ষণ চলিয়া গেল; চৈতন্যদেব নিঃশব্দে নিত্যানন্দের হস্ত ধরিয়া নিভৃত স্থানে লইয়া গেলেন; ইহাতে শিষ্যগণের মনে সন্দেহ দৃঢ়তর হইল। সকলেই গোপনে গোপনে পরামর্শ করিতে লাগিল; কেহই প্রকৃত কথা বুঝিতে পারিল না। চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন দেখ ভাই! ধর্ম্ম জগতের দুর্দ্দশা দেখিয়া বড় ব্যথিত হইয়াছিলাম এবং নূতন ধর্ম্ম জীবনের সৃষ্টি এবং উন্নতি করিব বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলাম ; কিন্তু সকল আশাই বিফল হইল ; জগতের হিতের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলাম কিন্তু হিত হওয়া দূরে থাকুক অনেক প্রকার অহিতের মূল হইলাম; নবদ্বীপবাসিগণ আমাকে শাস্তি দিতে ষড়যন্ত্র করিয়াছে; আর এসংসারে থাকিব না, শিখা সূত্র সমূলে ছেদন করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অব-

লঙ্ঘন করিব; দেশ দেশান্তরে নিজের বিশ্বাস ও প্রেম বিতরণ করিব; দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া নাম প্রচার করিয়া জীবন রক্ষা ও সফল করিব; তোমাকে মনের গুপ্তভাব জানাইলাম; জগতের উদ্ধার সাধনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি তোমরা কেহই প্রতিবাদী হইও না এই বলিয়া চৈতন্য দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। নিত্যানন্দ সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া রুদ্ধকণ্ঠ হইলেন; কিয়ৎক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া বলিলেন "প্রভু! আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন; আপনার গন্তব্য পথে কে প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে? চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া শিষ্যগণের মধ্যে আসিলেন। ক্রমে ক্রমে ভক্তশ্রেষ্ঠগণ তাঁহার মনোগত ভাব জানিতে পারিলেন; সকলেই গলবস্ত্র হইয়া তাঁহার নিকট গৃহে অবস্থিতির প্রার্থনা করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি পথ ভ্রান্ত হইবার লোক ছিলেন না; সকলকেই নিজের অভিপ্রায় বুঝাইয়া দিয়া সান্ত্বনা করিলেন। গ্রামে প্রচার হইল চৈতন্যদেব সংসার ত্যাগ করিবেন; শচীদেবীও একথা শুনিতে পাইলেন। এতদিন তিনি যে আশঙ্কায় চৈতন্যদেবের আচার ব্যবহারের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়াছিলেন তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে এই ভাবিয়া তিনি শোকাকুলা হইলেন এবং চৈতন্যকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। চৈতন্যদেবও জননীর ইচ্ছানুক্রমে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন; তাঁহাকে দেখিবামাত্র শচীদেবী মূর্চ্ছিতা হইলেন; অতিকষ্টে জ্ঞান পাইয়া ঘন ঘন

কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন নিমাই! সত্য সত্যই কি তুই সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইবি, তোর জন্যই এ সংসারে জীবন ধরিয়াছিলাম, বিশ্বরূপের এবং আটটী কন্যার শোক ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তুই আজ কোন ইচ্ছায় আমাকে এসংসারে অপার দুঃখভাগিনী করিয়া দেশত্যাগী হইবি; গৃহে থাকিয়া ধর্ম্ম পালন কর, অসহায়া জননীকে ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মোদ্দেশে কোথায় যাইবে? নিমাই! এতবুদ্ধিমান হইয়াও জননীর দুঃখ বুঝিলে না, অপত্যস্নেহের প্রভাব তুচ্ছ জ্ঞান করিলে; বৎস! তোমায় মিনতি করি অভাগিনী জননীকে ছাড়িয়া তুমি স্থানান্তরে যাইও না, আমার অনুরোধ রক্ষা করিও; দেখ তোমার বিরহকল্পনায় অভাগিনীর হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে; আবার অনুরোধ করি বৎস! আমাকে দুঃখিনী করিয়া কোথায়ও যাইও না; *মাতৃআজ্ঞা পালন ধর্ম্মের অঙ্গ জ্ঞান করিও; তোমাকে আর* কি বলিয়া হৃদয়ের দুঃখ বুঝাইব। এইরূপে বিলাপ করিয়া শচীদেবী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। চৈতন্যদেব স্থিরচিত্তে মাতাকে বলিলেন "মা! ধর্ম্মের প্রতিবাদী হইবেন না পুত্রের কুশল মাতার প্রার্থনীয় বিশেষতঃ যখন ধর্ম্মোদ্দেশে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছি তখন আর আপনি বাধা দিবেন না; আপনি শান্তচিত্ত হইয়া ধর্ম্মক্ষেত্রযাত্রী পুত্রের ভবিষ্যত মঙ্গলের জন্য আশীর্ব্বাদ করুন; অচিরাৎ আপনার সঙ্গে আবার দেখা হইবে। এইরূপ প্রবোধনায় শচীদেবী কথঞ্চিত শান্ত হই-

লেন। চৈতন্যদেবের সংসারে বিরাগ জন্মিয়াছে একথা দেশে দেশে ঘোষিত হইল, নানাদেশ হইতে তাঁহাকে দেখিবার জন্য লোক আসিতে লাগিল; চৈতন্যদেব স্বার্থপর সংসারের প্রতি বিশেষ বিরক্ত হইয়াছেন, যে জগতকে মুক্ত ও পবিত্র করিতে তাঁহার অবতারণা, সেই জগত আজ তাঁহার অনিষ্ট সাধনে রত এ ভাবনা তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল, সংসারে অনুরাগ, স্ত্রী পরিজনের সহিত সহবাসজনিত ভোগলিপ্সা যে ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অন্তর্দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক তাহা তিনি সংসারে থাকিয়া বিশেষ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পাষণ্ড-দল যে তাঁহার প্রতিপদের প্রতিদ্বন্দ্বী তাহা তিনি অবগত ছিলেন; সে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় তিনি ভগ্নোৎসাহ হইয়াছিলেন না। ভোগ সুখে রত ব্যক্তির ধর্ম্মকামনা সফল হওয়া দুঃসাধ্য; সম্প্রদায় বিশেষে ধর্ম্মপ্রচার করা তাঁহার অবতারণা নহে ইহা তাঁহার বিশ্বাস ছিল; দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, বনে বনে নাম প্রচার করিবেন, প্রেম বিতরণ করিবেন, ত্যাগস্বীকারের আদর্শ স্থাপন করিবেন, জগতকে নিস্পৃহতা শিক্ষা দিবেন ধর্ম্মের কঠোর ব্রতপালন জগজ্জনকে দেখাইবেন ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া অন্যের জীবনকে উৎসর্গ করাইতে শিক্ষা দিবেন; স্বার্থান্ধ জগতকে দিব্যচক্ষে দেখাইবেন যে ধর্ম্ম-জগতে অত্যাচার, অবনতি বিশ্বনিয়ন্তার অভিপ্রেত নহে এবং এরূপ অত্যাচার বা অবনতির প্রতীকার আসন্ন। কীর্ত্তি, আধি-

পত্য, গর্ব্ব কিছুই চৈতন্যের আকাঙ্ক্ষিত নহে, ধর্ম্মের জ্যোতিঃ উজ্জ্বলতম হউক; প্রেমে লোক মুগ্ধ হউক; ভক্তিতে লোকে মুক্তি পাউক; জাতি, বর্ণ সম্প্রদায় অভেদে ধর্ম্মপ্রচারিত ও অবলম্বিত হউক ইহাই তাঁহার গভীর ভাব। ধর্ম্মসূত্রে একতা, একতায় সহানুভূতি; সহানুভূতিতে বৈষম্য দূরীভূত হউক; জাতীয় প্রাণ দৃঢ়তর হউক; মুক্তির পথ সুগম হউক ইহাই তাঁহার প্রার্থনীয়।

ভক্তগণের মধ্যে কেহই জানিতেননা চৈতন্যদেব কোন দিন সংসার ত্যাগ করিবেন। সকলেই শঙ্কিতচিত্তে দিন কাটাইতেছেন; ভক্তদল নেতাহীন হইবেন এই ভাবনায় বিষণ্ণ ও ভগ্নোৎসাহ হইলেন; আর কেহই সন্তুষ্টচিত্তে সংকীর্ত্তনে মনঃসংযোগ করিতে পারেননা। চৈতন্যদেব এ সকল ভাব দেখিয়া ব্যথিত হৃদয় হইলেন; অনেক অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া ভক্তগণকে সম্মিলিত করিয়া বলিলেন শিষ্যগণ! তোমরা আমার অভাব ভাবিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য হইতে চ্যুত হইতেছে; আমি কোন মহদুদ্দেশ্য সাধনে দূরস্থ হইতেছি কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও যে আত্মযোগে ভক্তের হৃদয়ে ভক্ত উপস্থিত থাকে; তোমরা আমাকে দূরস্থ ভাবিবে কিন্তু আমি সর্ব্বদাই তোমাদের কার্য্যকলাপে যোগদান করিব; তোমাদের আধ্যাত্মিক কুশল চিন্তা আমার একমাত্র ব্রত জানিও অতএব তোমরা ভগ্নাশ হইও না, পূর্ব্ববৎ হরিসংকীর্ত্তনে রত হও, তোমাদের বিপক্ষ-

সম্পদ সকল অবস্থাতেই আমাকে দেখা পাইবে। এইরূপ সান্ত্বনা ও উৎসাহ বাক্য দিয়া ভক্তগণকে আশ্বস্ত করিলেন। কিন্তু তিনি কোন্ দিন সংসার ত্যাগ করিবেন তাহা কাহারও নিকট বলিলেন না। তিনি জানিতেন যে তাঁহার গমনের সময় জানিতে পারিলে শিষ্যগণ অনুগামী হইবে, কাজেই তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধ হইবার অনেক বাধা পড়িবে। তিনি যে কাহাকেও না জানাইয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন এরূপ নহে; বিপদে, সম্পদে, শোকে, দুঃখে সকল অবস্থাতেই তিনি নিত্যানন্দের নিকট মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেন; নিত্যানন্দও তাঁহার মত সমর্থন করিতেন। সংসার ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে বাস, দেশান্তরে ধর্ম্মপ্রচার ও ভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবন ধারণ করাই স্থিরীকৃত হইল তখন চৈতন্যদেব গৃহে অবস্থিতি করিয়া কল্পিত কল্পনা বিপজ্জনক করিতে ইচ্ছা করিলেন না। নির্জ্জনে নিত্যানন্দকে ডাকাইয়া বলিলেন ভাই নিত্যানন্দ! আমি আগামী কল্য রজনীযোগে সংসার ত্যাগ করিব; একথা কেবলমাত্র পাঁচজনের নিকট প্রকাশ করিবে। জননী, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, শ্রীচন্দ্রশেখর ও মুকুন্দ ব্যতীত যেন এ সংবাদ কেহ না জানিতে পারে। গোপনে গোপনে ইহারা জানিতে পারিলেন, স্থানান্তর যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল; সকলই বিষণ্ণভাবে দিবা অবসানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। আগামী কল্য চৈতন্যদেব সংসার ত্যাগ করিবেন, শিখাসূত্রের বিনাশ হইবে; সন্ন্যাস-

বেশ চিরসহায় হইবে, উপজীবিকার জন্য ভিক্ষার্থী হইতেই হইবে এ ভাবনা শচীদেবীর হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে আঘাত করিল; হৃদয়ের গভীর শোক তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল; তিনি কেবল কি হইবে বলিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেদিন কাটিয়া গেল; নবদ্বীপের দুঃখের দিন সন্নিহিত হইল।

১৪৩১ শকাব্দের উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন চৈতন্যদেব সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন চৈতন্যদেব নিজের মনোগত ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছেন; পরদিন প্রভাত হইলে নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, ব্রহ্মানন্দ, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ চৈতন্যের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। তিনি উপস্থিত ভক্তগণকে যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন আবার এ নবদ্বীপে তোমাদের সঙ্গে হরিগুণ কীর্ত্তন করিতে পারিব কিনা বলিতে পারিনা, তাই আজ এস সকলে মিলিয়া হরিগুণগানে জীবন সফল করি। তাঁহার কথায় ভক্তগণের চক্ষে জল আসিল; সকলেই একদৃষ্টে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তিনি আবার বলিলেন তোমাদিগকে বিষণ্ণ দেখিয়া আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে; একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখ সংসারে কি করিতে আসিয়া কি করিতেছিলাম; স্বর্গের পবিত্রতা হাতে পাইয়া পাপেও স্বেচ্ছাচারে কেমন নরকে ডুবিয়াছিলাম; ভক্তিহীন শুষ্ক কঠোর ও অপবিত্র

জীবন লইয়া সংসারক্ষেত্রে আর চলিতে পারি না তাই সংসার ত্যাগ করিতেছি; তোমরা সকলে এক মনে হরিনাম চিন্তা ও প্রচার কর এই আমার প্রার্থনা। চৈতন্যের আদেশানুসারে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল, আহারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এইরূপে সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল। সমস্ত শিষ্যগণ লইয়া চৈতন্য সেদিন নিজের আলয়েই আহার করিয়াছিলেন। দিবা অবসান হইয়া আসিল; চৈতন্যদেব যথাযোগ্য সম্ভাষণে সকলকে আলিঙ্গন করিয়া বাটীর মধ্যে আসিলেন। পুত্র রজনীতে সংসার ত্যাগ করিবে ভাবিয়া শচীদেবী গৃহের দ্বারদেশে ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন; চৈতন্যকে উপস্থিত দেখিয়া তিনি আর রোদন সম্বরণ করিতে পারিলেন না; হায়! কি হইবে বলিয়া মুর্চ্ছিতা হইলেন। অনেকক্ষণ পরে শচীদেবী সংজ্ঞা লাভ করিয়া করুণস্বরে বলিলেন বাবা নিমাই! তুমি কেন সংসার ছাড়িয়া বনে বনে বেড়াইতে যাইবে? তোমাকে হাঁসিতে দেখিলে নবদ্বীপ হাঁসে, কাঁদিতে দেখিলে কাঁদে! তোমার কিসের অভাব! তুমি যাহা চাহ তাহা কি গৃহে থাকিয়া পাওয়া যায় না? বৎস! গৃহশ্মশান করিয়া স্ত্রীকে আমরণ দুঃখিনী করিয়া তুমি কোথায় যাইবে? এই বলিয়া শচীদেবী কাঁদিতে লাগিলেন। চৈতন্যদেব দীনভাবে বলিলেন মা! সংসারে আমার কোন অভাব নাই; পাপের জন্য আমি কাঁদি না কিন্তু সংসারের পাপ দেখিয়া আমি সর্ব্বদাই কাঁদিয়া থাকি; আমি চলিয়া গেলে ঘর শ্মশান

হইবে, বিষ্ণুপ্রিয়ার কষ্ট হইবে, নবদ্বীপের লোকে হাহাকার করিবে কিন্তু মা! কি করিব? আমি সংসার না ছাড়িলে যে লোকে হরিনাম নেয় না, পাপস্রোত যে বন্ধ হয় না, হরিনাম যে কেহ বিলাইতে পারে না, সংসার যে নরকে ডুবিয়া হাহাকার করিতেছে, অধর্ম্ম যে দিনে দিনে সমস্ত দেশ ঢাকিয়া ফেলিল, স্বর্গের আলোক সংসারে আসেনা, লোকে আঁধারে মুক্তির পথ দেখিতে পায় না। এই বলিয়া তিনি জননীকে সান্ত্বনা করিলেন। সেদিন গদাধর, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ আর বাটীতে গেলেন না, চৈতন্যের আলয়েই থাকিলেন। কাহারও নিদ্রা হইল না, সকলেই মনের উদ্বেগে রহিলেন।

চৈতন্যপ্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়া পতির গৃহত্যাগের বিষয় কিছুই জানিতেন না; চৈতন্যদেবও তাঁহাকে নিজের মনের কথা খুলিয়া বলেন নাই। এরূপ কথিত আছে যে সংসারত্যাগের রাত্রিতে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত একবারও দেখা করেন নাই। গভীর নিশীথে যে পতিপ্রাণা অবলার সর্ব্বনাশ হইবে তাহা তিনি স্বপ্নেও জানিতে পারেন নাই, তিনি যে আমরণ দেব-তুল্য পতি সহবাসে বঞ্চিত হইবেন, প্রভাত হইলে যে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন না একথা ভ্রমেও কখন তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। অন্যান্য দিনের ন্যায় বিষ্ণুপ্রিয়া সেদিন সাংসারিক কার্য্য শেষ করিয়া নিরুদ্বিগ্নচিত্তে নিদ্রাভিভূতা হইয়া-ছিলেন; পতিকে জন্মের মত দেখিবার জন্য তাঁহাকে কেহই

জাগ্রত করিয়াছিল না। গভীর নিদ্রায় তাঁহার হৃদয়ের ধন অদৃশ্য হইয়াছিল; কালরাত্রি প্রভাতে যে মস্তকে বজ্রাঘাত হইবে তাহার পূর্ব্বলক্ষণ তিনি কিছুই দেখিতে পারেন নাই। চৈতন্যদেব কোথায় যাইবেন তাহা কেহই জানিতেন না; নিত্যানন্দ সকল বিষয়ই চৈতন্যকে অকপটচিত্তে জিজ্ঞাসা করিতেন এবং যথোচিত উত্তরও পাইতেন। নিত্যানন্দ চৈতন্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি সংসার ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবেন? চৈতন্যের বিশ্বাসছিল যে নিত্যানন্দ তাঁহার গন্তব্যস্থান জানিতেন কিন্তু কোথায় যাইবেন এই কথা শুনিয়া বিস্মিতভাবে বলিলেন সে কথা কি এখনও তোমার অবিদিত আছে; আমি কাটোয়া নগরে কেশব ভারতীর নিকট যাইব, তথায় সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হরিনাম প্রচারোদ্দেশে ভারতের সমস্ত স্থান বেড়াইতে ইচ্ছা করিয়াছি। এই বলিয়া কিছুকাল চুপ করিয়া রহিলেন পরে আবার বলিতে লাগিলেন ভাই নিত্যানন্দ! ধর্ম্মের নামে আজ হইতে জীবন উৎসর্গ করিলাম; যে দিন এসংসারে প্রবেশ করিয়াছিলাম সেই এক দিন, আর আজ এক দিন! লোকে হরিনাম নেয়না, ভক্তির আদর করে না, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের আশ্রয় দেয়, আত্মত্যাগের নামে স্বার্থের পূজা করে এসকল আর সহ্য করিতে পারিলাম না; স্বর্গ নরক হইতেছে দেখিয়া আমার হৃদয় শুখাইয়া গিয়াছে, তাই আজ তোমাদিগকে দেশে রাখিয়া হরিনাম প্রচারের জন্য দ্বারে দ্বারে বেড়া-

ইব, বৃক্ষতলে শয়ন করিব, ফল মূলে জীবন ধরিব। সংসারে থাকিয়া দেখিলাম কোন সুখ নাই; লোকে স্বার্থে অন্ধ হইয়া ধর্ম্মের আদর করে না, মুক্তির উপায় অবলম্বন করে না কেবল জাতি বিচারে, ঐশ্বর্য্যের অভিমানে সর্ব্বদাই লিপ্ত থাকিয়া অধর্ম্মাচরণ করে। এই রূপ কথাবার্ত্তায় কাহারও নিদ্রা হইল না।

গভীর নিশীথে চৈতন্যদেব শয্যা ত্যাগ করিয়া দেখিলেন রজনী অবসান প্রায়, জগত নিস্তব্ধ ও নির্জ্জীব, চন্দ্রের সুধাময় কিরণ অনেকক্ষণ হইল পশ্চিমগগণে মিশিয়া গিয়াছে, নিশাচর গণ প্রাণভয়ে স্ব স্ব আশ্রয়াভিমুখে ধাইতেছে; সংসার ত্যাগের এই প্রকৃত সময়, আর বিলম্ব করা উচিত নহে। চৈতন্যের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তগণ উঠিলেন; শচীদেবী জাগ্রতই ছিলেন, পুত্র কখন বিদায় হইবে আর দেখা পাইব না ইহা মায়ের প্রাণে সহিল না; নিমাইরে! তোমাকে ঘরে না দেখিয়া কেমন করিয়া বাঁচিব এই বলিয়া শচীদেবী প্রাণের গভীর শোকে কাঁদিতে লাগিলেন; পরক্ষণেই হতবুদ্ধি হইয়া শচীদেবী দ্বার রুদ্ধ করিয়া বলিলেন নিমাই! মায়ের প্রাণে ব্যথা দিয়া তুই কোন প্রাণে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিবি; মায়ের অনুরোধ রক্ষা করা কি তোমার ধর্ম্মের অঙ্গ নহে? নিমাই! বুক ফাটিয়া যায়! তোমাকে লইয়া সংসারের সমস্ত দুঃখ ভুলিয়াছিলাম; দুঃখিনীকে অকুল পাথারে ভাসাইয়া তুমি গৃহত্যাগী হইও না। জননীর নয়নে অশ্রুধারা বহিতে দেখিয়া চৈতন্য রুদ্ধকণ্ঠে বলি-

লেন মা! হরিনাম জপ কর; দুঃখের জন্য আমি সংসার ত্যাগ করিতেছিনা, অকাতরে জাতিবিচার না করিয়া প্রেম বিলাইব, হরিনাম প্রচার করিব এই উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসী হইয়া চলিলাম। তুমি আমার জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছ, নিজের সুখ ভুলিয়াছ, আমার দুঃখে গলিয়াছ কিন্তু মা! কি করিব, ধর্ম্মের ভার লইয়া সংসারে আসিয়াছিলাম, ধর্ম্মের ভার লইয়াই সংসার হইতে চলিলাম। এই বলিয়া চৈতন্যদেব মাতার পদযুগলে প্রণত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া বহির্গত হইলেন। জন্মের মত একবার সংসারের দিকে চাহিয়া ভ্রূকুটী করিলেন যেন আভ্যন্তরিক বলে বলিলেন সংসার! তোমার বন্ধন ছিড়িয়া চলিলাম; অনেক দিন তোমার সেবা করিয়াছি, অনেক দিন তোমার জন্য পাপকে আশ্রয় দিয়াছি; আর তোমার অত্যাচার সহ্য করিতে পারিলাম না, তাই আজ নিশাকালে তোমাকে ছাড়িয়া চলিলাম। নিশীথের নিস্তব্ধ জগত এক দৃষ্টে চৈতন্যদেবের আত্মত্যাগ দেখিল; ধর্ম্মবীরের উদ্দেশ্য স্থির; একটু মাত্রও কোনদৃশ্যে বিচলিত হইল না; সংসার একদিকে, ধর্ম্ম অন্যদিকে; মায়া, মোহ, বন্ধন একদিকে: ধর্ম্মের পবিত্রতা, অচল বিশ্বাস, অবিচলিত ভক্তি অন্য দিকে; সংসার পশ্চাতে রাখিয়া ধর্ম্ম অগ্রে করিয়া চৈতন্যদেব ইহজন্মের মত সংসারের সুখের নিকট বিদায় হইলেন। নিদ্রাভিভূতা রমণীর কথা মনে পড়িল না, জননীর কাতরোক্তি ও অনুরোধ গন্তব্য পথ প্রতি-

রোধ করিতে পারিল না, প্রিয় শিষ্যগণের অনুনয়ে হৃদয় বিচলিত হইল না। ধর্ম্মবীর নির্ভীকচিত্তে কতিপয় ভক্তগণ সঙ্গে করিয়া সংসার ত্যাগ করিলেন। এতদিন চৈতন্যদেব গৃহে থাকিয়া ত্যাগ সাধনের কিছুই দেখাইতে পারেন নাই, আজ রমণী, জননী, সুহচর, আত্মীয়জনকে ত্যাগ করিয়া আজন্ম পুষ্ট ধর্ম্মানুষ্ঠানে আত্মসমর্পণ করিলেন।

দ্বারদেশে শচীদেবী পাগলিনীর ন্যায় নিমাই! নিমাই! করিয়া চীৎকার করিতেছেন, উত্তর নাই, কে উত্তর দিবে? "নিমাই গৃহে নাই" "নবদ্বীপে নাই" বলিয়া প্রতিধ্বনি হইল! বিষ্ণুপ্রিয়ার নিদ্রাবস্থায় তাঁহার মস্তকে যে বজ্র পড়িয়াছে তাহা তিনি স্বপ্নে দেখিলেন; সহসা জাগিয়া দেখিলেন তাঁহার হৃদয়-সর্ব্বস্ব সংসারত্যাগ করিয়াছেন। তিনিও হা বিধাতঃ! বলিয়া ভূতলে মূর্চ্ছিতা হইলেন; কে কাহার তত্ত্বাবধান করে, কে কাহার মূর্চ্ছাপনোদনেব যত্ন করে সকলেই অধীর, সকলেই শোকার্ত্ত; একমাত্র চৈতন্যের অভাবে সকলে চৈতন্যশূন্য!

রজনী প্রভাত না হইতে হইতেই প্রকাশ হইয়া পড়িল চৈতন্যদেব সংসার ত্যাগ করিয়াছেন; নবদ্বীপের প্রতি ঘর হইতে হাহাকার উঠিল; বালক বৃদ্ধ, ধনী নির্ধন, মহৎ নীচ, ব্রাহ্মণ যবন, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক সকলেই একরবে হাহাকার করিতে লাগিল। সকলেই বুঝিতে পারিল নবদ্বীপ আজ আঁধারে পড়িল; মহাপুরুষ চৈতন্য প্রাণীর চৈতন্য দিবার জন্যই

আসিয়াছিলেন, ধর্ম্মের সজীবতা সাধনই তাঁহার ধর্ম্ম ছিল এবং সেই ধর্ম্ম প্রচার করিতে তিনি নবদ্বীপ ছাড়িয়া গেলেন। পাষণ্ডদলের হৃদয়ও বিগলিত হইয়া গেল, সকলেই মুক্তস্বরে হা চৈতন্য! হা চৈতন্য! বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। ভক্তদলের নেতা, নবধর্ম্ম প্রবর্ত্তক, ভক্তির আধার, প্রেমের অবতার চৈতন্য দেশান্তরিত হইলেন; জীবের উদ্ধার তাঁহার ব্রত হইল। তিনি অনেক দিন হইতে জীবের দুর্গতি দেখিয়া আসিতেছিলেন, অভক্তদিগের পরিণাম কল্পনায় তাঁহার হৃদয় নীরস হইয়াছিল; জরা, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু, দারিদ্র্যতা, পাপ, অত্যাচার এবং অভক্তির দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তাঁহার হৃদয় কলুষিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। সংসারে বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল, হৃদয়ের অন্তস্তলে আঘাত লাগিয়াছিল; তাই আজ গভীর নিশীথে জীবের মুক্তির উদ্দেশে গ্রামে গ্রামে বনে বনে হরিনাম প্রচারের জন্য চৈতন্যদেব আত্মত্যাগের জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। যৌবনের ইন্দ্রিয় প্রাবল্য, সংসারের ধর্ম্মদ্বন্দ্বী রিপু, স্নেহময়ী জননী, প্রণয় পুত্তলী বিষ্ণুপ্রিয়া কেহই ধর্ম্মবীরের গতি প্রতিহত করিতে পারিল না। একাগ্র মনে ধর্ম্মের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া চৈতন্যদেব সংসারের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

চৈতন্যদেবের গৃহত্যাগ সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ আছে; কোন কোন জীবনচরিত লেখক বলেন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের

সময় কেশব ভারতী বাঁশি বাজাইলে চৈতন্যদেব তাঁহার অনু-গমন করেন। এই জন্যই আজ পর্য্যন্ত ও আমাদের দেশে একটী সংস্কার প্রচলিত আছে যে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের পূর্ব্বে বংশী ধ্বনি শুনিলে বিধবারা জল গ্রহণ করিতে পারেন না। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এ প্রবাদের কোন সত্যমূলক কারণ পাওয়া যায় না। চৈতন্যদেবের সমকালিন কোনও ভক্তের গ্রন্থে তাঁহার সংসার ত্যাগের এরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয় না; তবে সিদ্ধান্ত এই যে যিনি যেরূপ শুনিয়াছেন তদনুযায়ী জীবনচরিত লিখিত হইয়াছে।

অনেকে মনে করেন চৈতন্যদেব পূর্ব্ববর্ত্তী আশ্রমত্রয়ের কর্ত্তব্য পালন না করিয়া কি প্রকারে সন্ন্যাসাশ্রমে সিদ্ধকাম হইলেন? কি প্রকারে তিনি অপরিণত বয়সে বিষয়ে নিস্পৃহ, জ্ঞানে অনুরক্ত ও ঈশ্বরে আত্মদান-পর হইলেন? গৃহস্থ বৈরাগীকে তিনি মহাজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম স্বীকার করিতেন তবে নিজে গৃহধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিলেন কেন? অন্যান্য জীবন চরিত লেখকগণ এ সকল বিষয়ের কোন মীমাংসা করেন নাই; আমরাও যে ইহার যথোচিত সিদ্ধান্ত করিতে পারিব এরূপ আশা নাই। জীব মাত্রেই উত্তম, মধ্যম, অধম ও অধমাধম এই অবস্থাচতুষ্টয়ের কোন না কোন অবস্থায় সংসারে জন্মগ্রহণ করে। যে প্রাণী জন্মাবধি জ্ঞানে পরিচালিত হয়, তাহাকে উত্তমাবস্থার লোক কহে। যে শক্তি দ্বারা ঈশ্বর ও আত্মার সংযোগে জগৎ সংসার

জানা যায় তাহাকে পণ্ডিতেরা জ্ঞান বলিয়া থাকেন; শুকদেব, ধ্রুব ও চৈতন্যদেব জন্মাবধি এইজ্ঞানে পুষ্ট ও চালিত হইয়া সংসারীকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ঈশ্বরে অনুরক্ত ও তন্ময় চিত্ত হইয়াছিলেন এবং পরিণামে জ্ঞানের বিজ্ঞান ক্রিয়া বা তুরীয় অবস্থা উপভোগ করিয়াছিলেন। জ্ঞানের সহিত প্রেম না মিলিলে এ অবস্থা মানুষে উপলব্ধি করিতে পারে না; ইহাই সাধনার দূরতম উদ্দেশ্য—ব্রহ্মলাভ এবং ভক্তিই ইহার মূল ভিত্তি; কেননা ভক্তি হইতে কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে উপাসনা, উপাসনা হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে বৈরাগ্য, বৈরাগ্য হইতে বিবেক এবং পরিশেষে বিবেক হইতে ব্রহ্মলাভের বিজ্ঞান ক্রিয়া আরম্ভ হয়। প্রাচীন বুধগণ "ত্যাগ" শব্দে দুইটী ভাব অন্তর্নিবিষ্ট আছে বলিয়া স্বীকার করেন; একটী লিপ্সার অভাব ও অন্যটী সংসার বর্জ্জন। চৈতন্যদেবের ত্যাগ স্বীকারে এই দুইটী ভাব ব্যতীত আর একটী ভাব বা উন্নত উদ্দেশ্য নিহিত ছিল; এই উদ্দেশ্যই তাঁহার সন্ন্যাস ধর্ম্ম ও সংসার ত্যাগের মূল কারণ। সংসারের ভোগেচ্ছা ত্যাগ করিয়া দেশে দেশে হরিনাম প্রচার, ভক্তি বিতরণ এবং প্রীতি, শান্তি, পবিত্রতা ও সাম্যতত্ত্ব সংস্থাপন করিবার জন্য তিনি সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন।

এদিকে প্রভাত হইবামাত্র চৈতন্যদেব সুরধনী পার হইয়া কতিপয় ভক্তের সঙ্গে কাটোয়া গ্রামনিবাসী কেশব ভারতীর

আলয়ে পৌঁছিলেন। সূর্য্যোদয় না হইতে হইতেই চৈতন্যের আদেশ অনুসারে গদাধর, মুকুন্দ, ব্রহ্মানন্দ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। কেশব ভারতী একজন শুদ্ধাত্মা ধর্ম্ম-পরায়ণ লোক ছিলেন, চৈতন্যদেবকে নিজ আলয়ে উপস্থিত দেখিয়া সসম্ভ্রমে আসন প্রদান করিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। চৈতন্য যথোচিত উত্তর প্রদান করিয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, গ্রামে প্রকাশ হইয়া পড়িল চৈতন্য এদেশে আসিয়াছেন; দেশের নরনারী আগ্রহ সহকারে চৈতন্যকে দেখিতে আসিল। ভক্তগণের প্রেমের ব্যাকুলতা দেখিয়া লোকে বিস্মিত! ভক্তির প্রভাবে যে লোক এত উন্মত্ত হইতে পারে ইহা তাহাদিগের প্রত্যক্ষ বিশ্বাস ছিল না। উপস্থিত লোকের হৃদয় মুগ্ধ হইয়া গেল; নর নারীর মুখ হইতে সমস্বরে ঘন ঘন হরিনাম উচ্চারিত হইতে লাগিল, এই সকল দেখিয়া কেশব ভারতী চৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু হইতে অস্বীকার করি-লেন; কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। শিক্ষাসূত্রের অন্ত-র্ধানের আয়োজন হইতে লাগিল; প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্যে-রই অভাব রহিল না। ক্ষৌরকার কর্ত্তৃক শিখাসূত্র সমূলে ছেদিত হইল; স্নানান্তে চৈতন্যদেব সন্ন্যাসধর্ম্মের মন্ত্র গ্রহণের জন্য কেশব ভারতীর সম্মুখীন হইলেন; ভয়ে কেশব ভারতীর হৃদয় শুকাইয়া গেল। শাস্ত্রজ্ঞ ধর্ম্মপরায়ণ ভক্ত চৈতন্যকে তিনি কি শিক্ষা দিবেন মনে মনে এই আন্দোলন করিতে-

ছেন। চৈতন্য ভাবে বুঝিতে পারিয়া বলিলেন স্বপ্নাবস্থায় সন্ন্যাস ধর্ম্মের মন্ত্র কে যেন আমাকে শিখাইয়াছেন; আপনি পরীক্ষা করিয়া দেখুন শিক্ষিত মন্ত্রগুলি যথার্থ কি না? চৈতন্য মন্ত্র বলিলেন; কেশব ভারতী তাহাই যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং মনে মনে চৈতন্যদেবের অজস্র প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মন্ত্র শিক্ষা হইলে চৈতন্যদেব সন্ন্যাসবেশ ধারণ করিলেন। চৈতন্যের মস্তক মুণ্ডিত, পরিধানে অরুণ বসন; এক হস্তে দণ্ড অপর হস্তে কমণ্ডলু দেখিয়া ভক্তগণের দুঃখের উচ্ছ্বাস উঠিল; তৎসময়ে তাঁহার বেশ দেখিয়া বৈরাগ্যের জলন্ত মূর্ত্তি বলিয়া প্রতীতি হইয়াছিল; চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস বেশ দর্শনে প্রেমদাস যে সঙ্গীতটী রচনা করিয়া গাইয়াছিলেন তাহা জনৈক কবির গ্রন্থ * হইতে অবিকল উদ্ধৃত হইল:—

"কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটীরে।
অপরূপ জ্যোতি, গৌরাঙ্গ মূরতি,
দুনয়নে প্রেম বহে শতধারে।
গৌর মত্ত মাতঙ্গের প্রায়, প্রেমাবেশে নাচে গায়,
কভু লুটায়ে ধরায়, নয়ন জলে ভাসেরে;
কাঁদে আর বলে হরি, স্বর্গ মর্ত্ত্য ভেদ করি,
সিংহ রবে রে;

---

* চিরঞ্জীব শর্ম্মা প্রণীত ভক্তিচৈতন্য চন্দ্রিকা।

আবার দন্তে তৃণ লয়ে; কৃতাঞ্জলি হয়ে,
দাস্যমুক্তি যাচেন দ্বারে দ্বারে।
কিবা মুড়ায়ে চাঁচর কেশ, ধরেছেন যোগীর বেশ,
দেখি ভক্তি ভাবাবেশ, প্রাণ কেঁদে উঠেরে;
জীবের দুঃখে কাতর হয়ে, এলেন সর্ব্বস্ব ত্যজিয়ে,
প্রেম বিলাতে রে।
প্রেমদাসের বাঞ্ছা মনে, চৈতন্য চরণে,
দাস হয়ে সঙ্গে বেড়াই ঘুরে॥"

নাম পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা হইলে কেশব ভারতী মহা বিপদে পড়িলেন। কথিত আছে অনেক বাদানুবাদ হইতেছে এমন সময় "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য" এই দৈববাণী হইল এবং উহাই তাহার নাম স্থিরীকৃত হইল, চতুর্দ্দিক হইতে ভক্তগণের আনন্দ ধ্বনি গগন বিদীর্ণ করিয়া উত্থিত হইল; কাটোয়া গ্রামবাসী সকলেই নিজ নিজ জীবনের স্বার্থকতা অনুভব করিলেন। অধিক দিন কাটোয়াতে থাকিলে এবং প্রকাশ হইলে নবদ্বীপ হইতে ভক্তগণ আসিয়া অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত দিতে পারে মনে করিয়া চৈতন্যদেব রাঢ়দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন, চন্দ্রশেখরকে কাটোয়া হইতে নবদ্বীপ যাইতে বিদায় দিলেন। চন্দ্রশেখর নবদ্বীপে আসিলে চৈতন্যের শিষ্যগণ তাঁহাকে বেষ্টিত করিয়া আগ্রহ সহকারে সমস্ত বিবরণ শুনিতে লাগিলেন। শচী-দেবীও একথা শুনিতে পাইলেন; তিনি চন্দ্রশেখরকে ডাকাইয়া

পুত্রের সমস্ত অবস্থা শুনিলেন। সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বনের কথা শুনিয়া তিনি রোদন সম্বরণ করিতে পারিলেন না; ভূপতিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে হা নিমাই! হা নিমাই! করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, অতি কষ্টে রোদন সম্বরণ করিয়া আধ্যাত্মিক চিন্তায় নিযুক্ত হইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

এদিকে চৈতন্যদেব গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে রাঢ়-দেশে উপস্থিত হইলেন। এরূপ বর্ণিত আছে যে তৎকালিন রাঢ়দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে চৈতন্যদেব এত বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিন দিবস তথায় তিনি মনের আনন্দে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ও নাম কীর্ত্তন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। রাঢদেশে বীরভূম জেলায় বক্রেশ্বরের মন্দির ছিল, তথায় নানা দেশ হইতে প্রতি বৎসর অনেক যাত্রীর সমাগম হইত, চৈতন্যদেব এই মন্দিরে বাস করিবেন বলিয়া অনুচর ভক্তগণের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, কিন্তু তাহাতে কেহই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন না; তিনি অনন্যোপায় হইয়া রাঢ়দেশেই কিছুকাল বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। চৈতন্যদেব রাঢ়দেশে একথন্য গ্রামে বাস করিয়াছিলেন; তথায় তিনি জনৈক ব্রাহ্মণালয়ে তিন দিন ছিলেন; তিনি প্রথমে রাঢ় দেশেই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ও ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন; তিনি যে কয়েকদিন ঐ দেশে ছিলেন অসংখ্য নরনারী তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, নানা

স্থান হইতে অনেক লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিত, তিনিও যথাযোগ্য সম্ভাষণে সকলকেই প্রীত করিতেন।

একদিন ভক্তগণ সমস্ত দিন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ও কীর্ত্তনে শ্রান্ত হইয়া একথন্য গ্রামে গভীর নিদ্রায় অভিভূত আছেন; চৈতন্যদেব সহসা জাগ্রত হইলেন; গভীর ও নিস্তব্ধ রজনীতে নিঃশব্দে আশ্রয় স্থান পরিত্যাগ করিয়া জন-শূন্য প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন; তথায় কেবল রোদনস্বরে প্রভু কোথায় রহিলে বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। গভীর রজনীতে বিজন প্রান্তরে কে তাহাকে সান্ত্বনা করিবে? নিজে ভাবোন্মত্ত হইয়া অবিশ্রান্ত প্রভুকে ডাকিতেছেন। রজনী প্রভাত হইলে ভক্তগণ জাগ্রত হইয়া দেখিলেন চৈতন্য নিকটে নাই। সকলেই সন্দিগ্ধ চিত্তে ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন কোথায়ও চৈতন্যের উদ্দেশ পাওয়া গেল না; সকলেই স্থির করিলেন চৈতন্যদেব অজ্ঞাতসারে নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন; সকলেই এই স্থির করিয়া বিষণ্ণ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া আছেন; সহসা অনতি দূরস্থ প্রান্তরাগত রোদন ধ্বনি ভক্তগণের হৃদয়ে আঘাত করিল; পরিচিত জনের কণ্ঠস্বর মনে করিয়া অনুসন্ধিৎসুচিত্তে ভক্তগণ রোদন ধ্বনি অনুসরণ করিয়া প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন চৈতন্যদেব হৃতসংজ্ঞা হইয়া প্রভু কোথায় রহিলে বলিয়া রোদন করিতেছেন; ভক্তগণ তথায় নামকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, চৈতন্য চেতনা পাইয়া

দেখিলেন সম্মুখে অনুচর ভক্তগণ হৃদয়ের গভীর কাতরতায় হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন। তখন তিনি সহাস্যবদনে ভক্তগণকে আশ্বস্ত করিয়া সদলে পশ্চিমাভিমুখী হইলেন। চৈতন্যদেব গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানেই ভ্রমণ ও কীর্ত্তন করিতে ভাল বাসিতেন; তাঁহার মনে বিশ্বাস ছিল গঙ্গার পবিত্র সলিল-ধৌত প্রদেশেই হরিনাম কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। চৈতন্যদেব অবিশ্রান্ত পশ্চিমাভিমুখে চলিতেছেন; বক্রেশ্বরের মন্দির চারি ক্রোশ দূরে অবস্থিত, তিনি তথায় গতিরোধ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখী হইলেন; কেহই তাঁহার গন্তব্য পথ বুঝিতে পারিলনা কেবল ছায়ার মত তাঁহার অনুগামী হইতে লাগিল ভক্তগণ জিজ্ঞাসা করিলে চৈতন্যদেব সর্ব্বদাই বলিতেন আমি নীলাচলে যাইব। চৈতন্যদেব নিত্যানন্দ ও অন্যান্য অনুগামী ভক্তগণকে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন আমি এখান হইতে ফুলিয়া নগরে হরিদাসের সঙ্গে দেখা করিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের আলয়ে উপস্থিত হইব; তোমরা সকলে তথায় পুনর্ব্বার আমাকে দেখা পাইবে। এইরূপ আদিষ্ট হইয়া নিত্যানন্দ ও অন্যান্য শিষ্যগণ অনুগমনে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং সত্বর পদে নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া ঘোষণা করিলেন চৈতন্যদেব শান্তিপুরে উপস্থিত হইয়াছেন। এ সংবাদে নবদ্বীপবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই আনন্দিত হইয়া শান্তিপুরে উপস্থিত হইল। নিত্যানন্দের মুখে চৈতন্যের

ভ্রমণ বৃত্তান্ত শুনিয়া শচীদেবীও পুত্র দর্শনাভিলাষিণী হইয়া শান্তিপুরে আসিলেন। নবদ্বীপে আর লোক থাকিল না; যে দেশের লোকে জানিতে পারিল যে চৈতন্যদেব কিছুদিনের জন্য শান্তিপুরে অবস্থিতি করিবেন সে দেশ লোকশূন্য হইল। নবধর্ম্ম প্রবর্ত্তক আবার এদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন এ আনন্দ দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল; আবার এদেশে হরিনাম কীর্ত্তিত, প্রেম বিতরিত, ভক্তি সঞ্চারিত হইবে এই ভাবনায় সমগ্র বঙ্গদেশ আনন্দে মাতিয়া উঠিল; চতুর্দ্দিক হইতে হরিধ্বনি করিতে করিতে অসংখ্য নর-নারী শান্তিপুরে উপস্থিত হইল। এদিকে চৈতন্যদেব ফুলিয়ানগর হইতে হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। চৈতন্যদেবকে সমাগত দেখিয়া বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্য মনের গভীর উচ্ছ্বাস দমন করিতে পারিলেন না। যাঁহাকে আর দেখিবার আশা ছিলনা তাঁহাকে গৃহে পাইয়াছেন আর আনন্দের সীমা রহিল না; অদ্বৈতাচার্য্যের নয়ন যুগল হইতে অবিরল আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল; আনন্দাধিক্য জন্যে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছিল। চতুর্দ্দিক হইতে অগণ্য নরনারী বালক বালি-কার কণ্ঠ হইতে একস্বরে হরিনামের ধ্বনি গগণ বিদীর্ণ করিতে লাগিল; সকলেই আকুলচিত্তে চৈতন্যদেবের অপূর্ব্ব বেশ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। নবদ্বীপ হইতে শচীদেবী, শ্রীবাস, মুকুন্দ, গদাধর, চন্দ্রশেখর, ব্রহ্মানন্দ, শ্রীধর, নিত্যানন্দ প্রভৃতি

ভক্তগণ চৈতন্যকে দেখিবার জন্য শান্তিপুরে উপস্থিত হই-লেন। অসংখ্য লোক চৈতন্যকে দেখিবার জন্য লালায়িত; ভক্তগণের আলিঙ্গন আরম্ভ হইল; চতুর্দ্দিক হইতে আনন্দের ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল, শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, করতাল, কাঁশরি প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র বাজিয়া উঠিল; শান্তিপুর এক অপূর্ব্ব দৃশ্য ধারণ করিল; কেহ কাহার মুখের দিকে চাহেনা; সকলেই নিজ নিজ আনন্দে বিহ্বল। এইরূপ বহুক্ষণ আনন্দের পর চৈতন্যদেবের সঙ্গে শচীদেবীর দেখা হইল; সন্ন্যাসীর বেশ নিরীক্ষণ করিয়া শচীদেবী স্থির থাকিতে পারিলেন না হা নিমাই! বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন; অনেক কষ্টে চেতনা পাইয়া শচীদেবী পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন নিমাই! এ কঠোর ব্রত পালন করিয়া, এ বেশ ধারণ করিয়া তুই এতকাল কিরূপে ছিলি; তোমাকেই জীবনের আশ্রয় জ্ঞানে এত দিন জীবন ধারণ করিয়াছিলাম; তুমি সংসার ছাড়িলে, আমার দশা কি হইবে*এই বলিয়া শচীদেবী রোদন করিতে লাগিলেন। চৈতন্য অনেক বুঝাইয়া জননীকে সান্ত্বনা করি-লেন; পরিশেষে একে একে ভক্তগণের আধ্যাত্মিক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন; আনুপূর্ব্বিক স্বদেশের সমস্ত বিবরণ অব-গত হইয়া চৈতন্যদেব সদলে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন; চতুর্দ্দিক হইতে হরিনামের ধ্বনি, প্রেমের সঙ্গীত ভক্তির উচ্ছ্বাস প্রকাশিত হইতে লাগিল। নূতন সন্ন্যাসী

চৈতন্যদেবের বৈরাগ্যের বিশুদ্ধগাম্ভীর্য্য, স্থির দৃষ্টি, তেজস্বিতা দ্বিগুণতর বৃদ্ধি হইযাছিল; পূর্ব্ব সহচরগণ এখন আর নির্ভয়ে তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহস করেন না; সন্ন্যাস-ধর্ম্মের কঠোর ব্রত পালনে চৈতন্যদেব সংযতেন্দ্রিয় হইয়াছেন কিন্তু পূর্ব্ববৎ মধুরভাষী আছেন ভক্তগণের প্রত্যেকের সঙ্গে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন; শচীদেবী পুত্রের মুখশ্রী বিবর্ণ, মস্তক মুণ্ডিত, পরিধানে রক্তবসন দেখিয়া শোকাবেগ দমন করিতে পারিলেন না; চৈতন্যদেব এত বুঝাইয়াছেন কিছুতেই তাঁহার চিত্ত বিস্মৃতশোক হইল না, তাঁহার পূর্ব্ব শোক জাগিয়া উঠিল, পুরাতন কথা নূতন হইল; তিনি সজল নয়নে চৈতন্যদেবকে উদ্দেশ করিয়া পুনঃ পুনঃ গৃহস্থাশ্রমে বাস করিবার ইচ্ছা জানাইলেন কিন্তু যখন চৈতন্যদেব সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন তখন মাতৃ অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না কেবল মাতার নিকটে প্রতিশ্রুত হইলেন গৃহাশ্রম বর্জ্জিত তিনি যেখানে বাস করিতে বলিবেন সেখানেই থাকিবেন; এইরূপে শচীদেবী বীতশোক ও আশ্বস্ত হইলেন। চৈতন্যদেব মহানন্দে দশ দিন শান্তিপুরে অবস্থান করিলেন। শচীদেবী উপবাসশীর্ণ পুত্রকে ভক্তগণ সহ ভোজন করাইলেন; চৈতন্যদেব নীলাচল গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া জননী ও ভক্তগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। যে সময়ে তিনি নীলাচলে যাত্রা করেন সে সময়ে

উড়িষ্যাবাসীদিগের সহিত মুসলমান রাজাদিগের ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছিল; দেশে অরাজকতা, দস্যু কর্ত্তৃক লুণ্ঠন ও মহামারি বিরাজ করিতেছিল; এইজন্য অনেকেই চৈতন্যদেবকে এ সময়ে বঙ্গদেশ ছাড়িতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু চৈতন্যদেব কাহারও অনুরোধ রক্ষা না করিয়া নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালীন সমস্ত শিষ্যগণকে একত্র সম্মিলিত করিয়া আধ্যাত্মিক ব্রতপালনের উপদেশ বিবৃত করিয়া দিলেন। জননীর পদযুগলে প্রণত হইয়া চৈতন্যদেব অনেক বুঝাইয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন। প্রত্যেক ভক্তের সঙ্গে যথাযোগ্য আলাপ, আলিঙ্গন, উপদেশ দিয়া নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, ব্রহ্মানন্দ, জগদানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া চৈতন্যদেব নীলাচলে যাত্রা করিলেন।

——00——

ষষ্ঠ অধ্যায়।

এইরূপে মহাপুরুষ চৈতন্য হরিনাম প্রচারের জন্য সংসারত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে বনপথে নীলাচল যাত্রা করিলেন। বৃক্ষমূল তাঁহার আশ্রয়, মুষ্টিভিক্ষা তাঁহার জীবিকা, কৌপীন, দণ্ড ও ভিক্ষাপাত্র তাঁহার চিরসহচর হইল। গার্হস্থ্যধর্ম্ম, স্নেহময়ী জননী, প্রণয়াধার বিষ্ণুপ্রিয়া, বাল্যসহচর ত্যাগ করিয়া

ধর্ম্মবীর প্রেম বিতরণে জীবন উৎসর্গ করিলেন। "হরিনাম বল, হরিনাম জপ, হরিনাম শিক্ষা কর" একমাত্র এই রবে কতিপয় ভক্তের সহিত চৈতন্যদেব আঠিসারা গ্রামে উপস্থিত হইলেন; অনন্ত নামে একজন সাধুর আবাসে রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন প্রভাত হইবামাত্রই সাধুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। চৈতন্যের সঙ্গীগণের মধ্যে কেহই পথ জানিতেন না এবং পথে কোন লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেও উড়িষ্যার রাজার গুপ্তচর মনে করিয়া কেহ সদুত্তর দিত না। কিন্তু চৈতন্যের হৃদয় নিরাশার উপকরণে গঠিত হয় নাই; তিনি যে সদনুষ্ঠানে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন সহস্র বিপত্তির সম্মুখীন হইলেও অভীষ্ট পথ হইতে বিমুখ হইবার লোক ছিলেন না। যদিও তিনি কোন্ পথে নীলাচলে যাইতে হইবে জানিতেন না, তথাপি গঙ্গার তীর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন; পথভ্রমণে তাঁহার শ্রান্তি নাই, ক্ষুৎপিপাসায় তাঁহার দেহ অবসন্ন হয় না, আতপত্র হীন হইলেও রৌদ্রের প্রখর তাপে তিনি ক্লিষ্ট নহেন; কেবল অবিশ্রান্ত প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া হরিনাম গান করিতে করিতে ভ্রমণজনিত সমস্ত কষ্ট বিস্মৃত হইতেন। এইরূপ শারীরিক কষ্ট অকাতরে সহ্য করিয়া চৈতন্য ছত্রভোগ গ্রামে উপস্থিত হইলেন; এইখানে গঙ্গা শতমুখী হইয়া সমগ্র বঙ্গদেশকে সিক্ত করিয়াছে; কথিত আছে যে শিব সগরবংশতিলক ভগীরথ গঙ্গা আনিবার সময়

এই স্থানে গঙ্গার বিরহে অধীর হইয়া জলময় হইয়াছিলেন ; এই জন্যই এই স্থান অম্বুলিঙ্গ ঘাটকর বলিয়া প্রসিদ্ধ। ছত্রভোগে উপস্থিত হইয়া চৈতন্য অম্বুলিঙ্গঘাটে স্নান করিলেন ; তাঁহার সঙ্গীগণও তথায় স্নান করিয়া হরিনাম গান করিতে লাগিলেন। হরিনাম কীর্ত্তনে গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা আসিয়া নদীতীরে উপস্থিত হইল ; চৈতন্যদেব প্রেম বিহ্বল হইয়া হরিনাম গান করিতে লাগিলেন। গ্রামের মধ্যে প্রেমোন্মত্ত সন্ন্যাসীর আগমনবার্ত্তা প্রচার হইলে তত্রত্য জমিদার রামচন্দ্র খাঁ চৈতন্যের সহিত দেখা করিবার জন্য গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। অনুরুদ্ধ হইয়া চৈতন্যদেব রামচন্দ্র খাঁর আলয়ে আতিথ্য-স্বীকার করিয়া নিশাবসানে উৎকল দেশে আসিবার জন্য নৌকারোহণ করিলেন। রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় বিপদ আশঙ্কা করিয়া রামচন্দ্র খাঁ কতিপয় বিশ্বস্ত শরীররক্ষী দিতে চাহিলেন কিন্তু চৈতন্যদেব বলিলেন আত্মরক্ষার্থ হরিনাম ভিন্ন আমার আর কোন অস্ত্রের প্রয়োজন নাই। চৈতন্যদেব যেখানে যাইতে লাগিলেন সেই স্থানেই তাঁহার ভক্তির প্রগাঢ়তায় শত শত হৃদয় মুগ্ধ হইতে লাগিল ; তাঁহার পথে অনেক লোক ছুটিল, অনেকে সংসার ধর্ম্ম-ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিল। তিনি ভক্তিগানে ও প্রেম বিতরণে জগৎ মুগ্ধ করিতে, ধর্ম্মজীবনের উন্মত্ত অবস্থার আদর্শ রাখিতে বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার নিস্পৃহতা, আত্মোৎসর্গ, ধর্ম্ম-পিপাসা, ঐকান্তিক ভক্তি

জগতের অনন্ত ও অক্ষয় আদর্শ; যতদিন এজগতে সৃষ্টি-প্রবাহ বহিবে ততদিন তাঁহার জীবন, তাঁহার ভাব প্রত্যেক ধার্ম্মিক-জীবনের শোণিতস্বরূপ হইয়া প্রতি ধমনীতে অবিশ্রান্ত ছুটিয়া বেড়াইবে।

হরিনাম গান করিতে করিতে চৈতন্যদেব শিষ্যগণসহ যথাসময়ে উৎকল দেশে উপস্থিত হইলেন; তাঁহাদের আগমন বার্ত্তা পাইয়া তদ্দেশবাসী ভক্তগণ ভক্তির অবতার চৈতন্যকে দেখিবার জন্য নদীতীরে ছুটিল; প্রেমে পাগল, বিষয়ভোগে উদাসীন, যৌবনে সন্ন্যাসী কেমন তাহাই দেখিবার জন্য সকলেই গৃহকার্য্য রাখিয়া পথে দৌড়াইতে লাগিল। চৈতন্যদেবকে যিনি দেখেন তিনিই মুগ্ধ, তিনিই জীবনে, যৌবনে, বিলাস-ভোগে ধিক্কার দিতে লাগিলেন; কাহারও মুখে কোন কথা নাই; সকলেই একদৃষ্টে তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এমন সুন্দর পুরুষ কি ভিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে, কাহার জন্য তরুতল আশ্রয় করে, সংসার সুখভোগে কেন নিস্পৃহ; দর্শকগণের মধ্যে এই সকল তর্ক উঠিতে লাগিল: কেহই প্রকৃত মীমাংসা করিতে পারিল না; ধর্ম্ম-জীবনের গতি কেহই বুঝিল না!

একদিন চৈতন্যদেব একাকী গ্রামের মধ্যে ভিক্ষা করিতে গেলেন। তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দর্শনে পথের লোক এক-দৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল; কেহই কোন কথা জিজ্ঞাসা

করিতে সাহস করেনা। তিনিও প্রশান্ত ভাবে দ্বারে দ্বারে বেড়াইতে লাগিলেন, নর-নারীগণ নানাবিধ খাদ্যাদি দিয়া তাঁহার ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করিয়া দিল; তিনি কাহারও সহিত কোন কথা না বলিয়া সঙ্গীগণের নিকটে আসিয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদি দেখাইলেন। সকলেই বিস্মিতভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কোন উপদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, তিনি ধীরভাবে বলিলেন আমি এ কাজ করিতে পারি; তাঁহারাও সকলে হাসিয়া বলিলেন তুমি আমাদিগের ভার বহন করিতে পারিবে।

একদিন জগদানন্দ নিত্যানন্দের নিকট চৈতন্যদেবের দণ্ড রাখিয়া গ্রামের মধ্যে ভিক্ষা করিতে গেলেন, আসিয়া দেখেন যে নিত্যানন্দ ভগ্নদণ্ড হাতে করিয়া হাসিতেছেন। জগদানন্দ ভগ্নদণ্ড দেখিয়া বিস্মিতভাবে নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কেন এ দণ্ড ভাঙ্গিলে? নিত্যানন্দ কহিলেন আমি যাঁহাকে সর্ব্বদা হৃদয়ে বহন করি তিনি যে এদণ্ড বহন করিবেন ইহা আমি দেখিতে পারিনা। এইরূপ কথায় জগদানন্দ আর কিছু না বলিয়া ভীত হইলেন; কিছুক্ষণ পরেই চৈতন্যের সঙ্গে নিত্যানন্দের দেখা হইল; চৈতন্য বলিলেন নিতাই! কেন তুমি আমার দণ্ড ভাঙ্গিলে? নিত্যানন্দ উত্তর করিলেন, বাঁশখানি ভাঙ্গিয়াছিতো যদি ক্ষমা করিতে না পার শাস্তি দাও অকাতরে সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি। চৈতন্য

বলিলেন যে দণ্ডে সর্ব্বদেবের অধিষ্ঠান তোমার মতে কি তাহা একখানি বাঁশ হইল? চৈতন্যের হৃদয় কখনও কোন অবস্থায় নির্ম্মম হইতে জানে না; শিষ্যগণের অন্যায় ব্যবহারে দুঃখিত হইতেন বটে কিন্তু তজ্জন্য কাহাকেও কোন কথা বলিতেন না। চৈতন্যদেব আবার বলিলেন আমার একমাত্র সঙ্গী দণ্ডও ভাঙ্গিয়া গেল; আর আমার সঙ্গী কেহই নাই; এক্ষণে তোমরা আগে যাও, না হয় আমাকে আগে যাইতে দাও। মুকুন্দ বলিলেন তবে তুমিই আগে যাও। শিষ্যগণের প্রতি কেমন সরল ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহার! চৈতন্যদেব কাহারও প্রতি রুষ্ট হইলেও তাহার বাহ্যিক ভাবে তাহার কোন লক্ষণ প্রকাশ হইত না।

চৈতন্যদেব সঙ্গীগণকে পশ্চাতে রাখিয়া একাকীই আপন-ভাবে মত্ত হইয়া চলিতে লাগিলেন, তিনি অবিশ্রান্ত চলিতেছেন, শ্রান্তি নাই, পিপাসা নাই, অনিচ্ছা নাই; অনেকক্ষণ পথ ভ্রমণের পর তিনি জলেশ্বর গ্রামে পৌঁছিয়া সঙ্গীগণের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সকলে আসিয়া একত্রিত হইলে চৈতন্যদেব জলেশ্বরের দেবমন্দির দেখিতে চলিলেন; দেবমূর্ত্তি দর্শন, দেবালয় সন্নিধানে বাস, ভক্তগণের উপাসনা শ্রবণ করিতে তিনি বড় ভাল বাসিতেন এবং সময়ে সময়ে নিজের ভাবে অধৈর্য্য হইয়া রোদন করিতেন; এইরূপে তিনি শিষ্যগণের সহিত কটক, যাজপুর, ভুবনেশ্বর পরিভ্রমণ করিয়া কমলপুর নামক স্থানে উপ-

স্থিত হইলেন ; এইস্থান হইতে জগন্নাথদেবের মন্দিরের ধ্বজা দৃষ্ট হয়। চৈতন্যদেব জগন্নাথক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন মনে করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন ; ভক্তগণের মুখ হইতে অবিশ্রান্ত হরিনাম উচ্চারিত হইতে লাগিলেন। সকলেই উৎসাহে ও আনন্দে পুরীর দিকে পদচালনা করিতে লাগিলেন। কমলপুর হইতে পুরীতে আসিতে হইলে চারি দণ্ডের অধিক সময় লাগেনা ; কিন্তু ভক্তগণ পথের পার্শ্বে দেবালয়, সুরম্য ও নির্জন বন, স্বচ্ছসরোবর, এতদ্দেশীয় লোকের আচার ব্যবহার দেখিতে দেখিতে অনেক বিলম্বে পুরীতে পৌঁছিলেন। পুরীতে পৌঁছিয়া চৈতন্যদেব জগন্নাথদেবকে দেখিতে গেলেন ; মন্দিরাভ্যন্তরে উপাসকগণের চিত্তের একাগ্রতা ও ধর্ম্মপিপাসা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় অস্থির হইল। তিনি স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন এবং মনের আবেগে হৃদয়ের বেদনা জানাইতে লাগিলেন। সকলে দেখিয়া অবাক্ ; এমন সাধক কোথা হইতে আসিল ইহাই জানিবার জন্য সকলের কৌতূহল জন্মিল। অনেকক্ষণ পরে নিত্যানন্দ অন্যান্য ভক্তগণের সঙ্গে আসিয়া দেখেন চৈতন্য ভূলুণ্ঠিত ও সংজ্ঞাশূন্য ; সকলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। চৈতন্যদেব সংজ্ঞা পাইয়া দেখিলেন সম্মুখে নিত্যানন্দ ; একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন তোমাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছি এজন্য তো দুঃখিত হও নাই ;

তিনি এইরূপ অমায়িক ভাবে শিষ্যগণের সহিত ব্যবহার করিতেন যে তাহারা কোন কারণে বিন্দুমাত্রও দুঃখিত হইতে পারিত না; কাহাকে কোন অনুচিত কথা বলিলে পরক্ষণেই বালকের ন্যায় কাঁদিতেন এবং মনের গভীর আগ্রহে পুনঃ পুনঃ ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেন। ক্ষমা ও বিনয়ে তিনি জগতকে নিজের প্রেমে বাঁধিয়াছিলেন; যেখানে তিনি যাইতেন শতসহস্র লোক তাঁহার বিনীত ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিত। চৈতন্যদেব যে সময়ে জগন্নাথদেবের মন্দিরের মধ্যে মূর্চ্ছিত হয়েন সে সময়ে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নামা একজন তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ পণ্ডিত তথায় উপস্থিত ছিলেন। নবদ্বীপে ইঁহার বাসস্থান ছিল, পরে পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত পদে নিযুক্ত হইয়া এইখানে বাস করিতে থাকেন। নবীন সন্ন্যাসীর অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল; বিশেষতঃ তিনি যখন পুরীর তত্ত্বাবধায়ক, তখন পুরীর মধ্যে ভক্তগণের দুর্গতি অপনোদন করা তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। তিনি চৈতন্যের আন্তরিক ব্যাকুলতা দেখিয়া তাঁহাকে নিজ আলয়ে লইয়া আসিলেন। পরে যখন নিত্যানন্দের মুখে শুনিলেন যে নবীনসন্ন্যাসী বিশারদেরবন্ধু নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র তখন তিনি অধিকতর আগ্রহ সহকারে চৈতন্যের মূর্চ্ছাপনোদনের যত্ন করিতে লাগিলেন। চৈতন্যদেব লব্ধসংজ্ঞ

হইলে সকলে মিলিয়া মুক্তস্বরে হরিনাম গান করিতে লাগিলেন, এইরূপে অনেক সময় অতিবাহিত হইলে তাঁহারা সমুদ্রে স্নানকরিয়া মহানন্দে জগন্নাথের প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এপর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই নবীন সন্ন্যাসী কাহার উপাসক; যখন তিনি পূজ্য মনে করিয়া প্রণাম করিলেন তখন চৈতন্যদেব "হরিভক্তি হউক" এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সার্ব্বভৌম তখন বুঝিলেন যে চৈতন্যদেব বৈষ্ণব সন্ন্যাসী; যৌবনে এরূপ কঠোর ব্রত ধারণ তাঁহার মনে ভাল লাগিল না; তাহা হইলেও তাঁহার মন চৈতন্যের দিকে নানা কারণে আকৃষ্ট হইয়াছিল। সার্ব্বভৌম জ্ঞানে অদ্বৈতবাদী ও অনুষ্ঠানে বৈষ্ণব ছিলেন; একজন অদ্বিতীয় বৈদান্তিক দর্শনবিদ্ বলিয়া সমাজে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল; অনুষ্ঠানে বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া তিনি জগন্নাথদেবের সেবা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম চৈতন্যের বিনীত ব্যবহারে প্রীত হইয়া চৈতন্যকে বলিলেন আমাকে যদি তোমার শিষ্যকর তাহা হইলে অনেক শিক্ষা করিতে পারি। চৈতন্য এই কথা শুনিয়া লজ্জিত হইয়া বলিলেন আমি বালক, অল্পদর্শী ও সাংসারিক বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ; আমার নিকট হইতে আপনি কিছু শিক্ষা করিবেন ইহা নিতান্ত অযুক্তির কথা; আমি আপনার নিকট অনেক বিষয়ে মূর্খ; আপনি যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা

দেন তাহা হইলে বড় উপকৃত হই। সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের সহিত চৈতন্যের সঙ্গী মুকুন্দের অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ* এবং জ্ঞান ও ভক্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বদিন অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। সার্ব্বভৌমের ইচ্ছা যে শাস্ত্রোক্তি দ্বারা তিনি চৈতন্যদেবকে অদ্বৈতবাদী করেন। বৈরাগ্যব্রত ত্যাগ করাইয়া যাহাতে তিনি আবার সাংসারিক হয়েন ইহাই পণ্ডিতের ঐকান্তিক চেষ্টা। কিন্তু যখন শুনিলেন যে চৈতন্য বিখ্যাত দ্বৈতবাদী মাধবাচার্য্যের মতের শিষ্য তখন তিনি কিছু সঙ্কুচিত হইলেন; তথাপি ও তিনি নিজের উদ্দেশ্য ত্যাগ করিলেন না। চৈতন্যদেব শিষ্যগণের সহিত পুরীতেই বাস করিতে লাগিলেন; তত্রত্য খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের সহিত সময়ে সময়ে তাঁহার ধর্ম্মসম্বন্ধে ঘোরতর তর্ক হইত।

একদিন সার্ব্বভৌম পণ্ডিত নানা কথাবার্ত্তার পর চৈতন্যকে বলিলেন দেখ তুমি যৌবনে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ভাল কায কর নাই কেন না ধর্ম্মসম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতা নিতান্ত সামান্য; তুমি যেরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হইয়াছ তাহাতে তোমার বেদান্ত পড়া উচিত; অতএব আমি তোমাকে বেদান্ত পড়াইয়া ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল সরল ভাবে বুঝাইয়া দিব। চৈতন্য বলিলেন আমিও উপযুক্ত গুরুর অভাবে এ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের কিছুই শিক্ষা করিতে পারি নাই; আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার শিক্ষা বিধানে যত্নপর হয়েন তাহা হইলে আমি বড় উপকৃত

হই। চৈতন্যের কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম পণ্ডিত সন্তুষ্টচিত্তে বেদান্ত পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। উপর্য্যুপরি একসপ্তাহ কাল তিনি বেদান্ত পাঠ করিলেন; চৈতন্য নিবিষ্ট মনে শুনিতে লাগিলেন, কোন তর্ক বা কোন প্রকারের সন্দেহ মীমাংসার জন্য পণ্ডিতকে একবারও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। অষ্টম দিবসে সার্ব্বভৌম পণ্ডিত চৈতন্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন আজ সাতদিন হইল ক্রমাগত বেদান্ত পাঠ করিয়া যাইতেছি, তুমি কি সকলই বুঝিতেছ যে কোন কথাই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে না? চৈতন্য বলিলেন আমি ধর্ম্মবিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ; কি জিজ্ঞাসা করিব কিছুই স্থির করিতে পারি না; কেবল সন্ন্যাসধর্ম্মের অনুরোধে আমি বেদান্ত শুনিতেছি। যে সমস্ত সূত্র পঠিত হইল তাহার অর্থ বেশ বুঝিতে পারিতেছি কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা আমার কাছে সরল ও প্রকৃত বোধ হইতেছে না। বেদ পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীনতম ধর্ম্মগ্রন্থে ব্রহ্মতত্ত্ব স্পষ্টরূপে নিরূপিত হইয়াছে। বেদান্ত হইতে অদ্বৈতবাদ ও সাংখ্য হইতে প্রকৃতিবাদ, এই দুইটী বিষম সমস্যা অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। অদ্বৈতবাদ আবার বিবর্ত্ত-বাদ ও মায়াবাদ রূপে দ্বিবিধ হইয়াছে। ঐ সকল মতাবলম্বীরা কেহ জগৎকে ব্রহ্মপরিণাম, কেহ জগৎকে মিথ্যা, কেহ জগৎকে অনাদিপ্রসূত বলিয়া মত স্থাপন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু বুধগণ বলেন, যে ভগবান্ সমস্ত কার্য্যকারণ

হইতে ভিন্ন, অথচ নিজ অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা শক্তির ত্রিবিধ (বৈকুণ্ঠ, জৈব ও মায়িক) কার্য্যে বিরাজমান আছেন। সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ ভগবান পরমাত্মা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ও অচিন্ত্য-শক্তি সম্পন্ন। মায়াপ্রকৃতি ও জীবপ্রকৃতি ভগবানের পরাশক্তির প্রভাব বিশেষ; এই উভয় প্রকৃতি হইতে সমস্ত চেতন ও অচেতন বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে। সারগ্রাহীগণ ব্রহ্মের পরা-শক্তির তিনটী ভিন্ন ভিন্ন ভাব অনুভব করেন যথা:—সৎ (সন্ধিনী) চিৎ (সম্বিৎ) আনন্দ (হ্লাদিনী); তাহা হইলে যে আপনি তাঁহাকে নিঃশক্তি বলিতেছেন তাহা সম্ভবপর নহে! আপনি তাঁহাকে নিরাকার বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন তাহাই বা কিরূপ যুক্তিমূলক? তিনি স্বয়ং অপাদান, করণ এবং অধিকরণ কারক কেননা বিশ্ব তাঁহা হইতে উৎপন্ন, তাঁহা দ্বারা জীবিত ও তাঁহাতেই বিলীন হয়। শ্রুতিতে ইহা স্পষ্ট লিখিত রহিয়াছে যে তাঁহার হস্ত পদ নাই অথচ তিনি গ্রহণ করেন ও চলেন।

সার্ব্বভৌম পণ্ডিত চৈতন্যের শাস্ত্র-জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া অবাক্ হইলেন; কিন্তু অভিমানী পণ্ডিত তথাপিও তর্ক ছাড়িলেন না। চৈতন্য পণ্ডিতের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে সৌনকাদির প্রতি সূত বলিয়াছেন:—

"আত্মারামশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরু ক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্য হৈতুকীং ভক্তিমিত্থং ভূতোগুণো হরিঃ॥"

সার্ব্বভৌম পণ্ডিত এই শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিতে চাহিলেন। চৈতন্য বলিলেন আপনিই ইহার ব্যাখ্যা করুন, সার্ব্বভৌম পণ্ডিত মানের ভরে ত্রয়োদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন "আমার আর সাধ্য নাই যে ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করি।" চৈতন্য হাসিয়া আঠার প্রকার নূতন ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলেন। পণ্ডিত অবাক্ হইয়া চৈতন্যের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন; তিনি যে নিতান্ত অদূরদর্শীর ন্যায় চৈতন্যের অবমাননা করিয়াছেন, এইজন্য পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার নিকট ভক্তিভিক্ষা করিলেন। চৈতন্যও উদারভাবে পণ্ডিতকে আলিঙ্গন দিয়া বলিলেন, জীবমাত্রেই সময়ে সময়ে ভ্রান্ত হয়, তজ্জন্য আপনি দুঃখিত হইবেন না, একান্ত মনে হরিতে মন সমর্পণ করিয়া আধ্যাত্মিক চিন্তায় দিনপাত করুন। চৈতন্যের সঙ্গিগণের মধ্যে তুমুল আনন্দধ্বনি পড়িয়া গেল; সকলেই একরবে হরিনাম উচ্চারণ করিতে লাগিল; অদ্বিতীয় পণ্ডিত সার্ব্বভৌমের শাস্ত্রাভিমান চূর্ণ হইয়া গেল!

সার্ব্বভৌমকে ভক্তিপ্রদান করিয়া চৈতন্যদেব গ্রীষ্ম ঋতুর আরম্ভে একদিন শিষ্যগণকে বলিলেন, অনেক দিন হইতে

"বহিরঙ্গা মায়াশক্তি, তটস্থা জীবশক্তি উপাদান এবং পরাশক্তি নিমিত্ত কারণ এই শক্তিত্রয় বিশিষ্ট ঈশ্বরকে চৈতন্য কৃষ্ণ বলিতেন।"

ভক্তিচৈতন্য চন্দ্রিকা।

তোমাদের সহবাসে আনন্দে দিন কাটাইতেছি, এখন তোমরা আমাকে কিছুদিনের জন্য বিদায় দাও; আমি একাকী বিশ্বরূপের অনুসন্ধানে দাক্ষিণাত্যের তীর্থস্থান ভ্রমণ করিতে যাইব; আমি যতদিন সেতুবন্ধ হইতে ফিরিয়া না আসি, ততদিন তোমরা এইস্থানে আমার জন্য অপেক্ষা করিও। চৈতন্যের কথা শুনিয়া সকলেই তাঁহার অনুগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কাহারও ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। পরিশেষে নিত্যানন্দের আন্তরিক অনুরোধে চৈতন্যদেব কৃষ্ণদাস নামক একটী সরলচিত্ত ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। চৈতন্যদেব নীলাচল ত্যাগ করিয়া যাইবেন ইহা নবভক্ত সার্ব্বভৌমের প্রাণের নিভৃত কক্ষে আঘাত করিল, তিনি ব্যাকুল হৃদয়ে চৈতন্যের অনুচর হইতে চাহিলেন কিন্তু পূর্ণকাম হইতে পারিলেন না। চৈতন্যদেব সার্ব্বভৌমের ব্যাকুলতায় নীলাচলে পাঁচদিন হরিনাম গান করিয়া দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। শান্তপ্রকৃতি কৃষ্ণদাস নীরবে চৈতন্যের অনুগমন করিতে লাগিলেন। যাত্রাকালে সার্ব্বভৌম চৈতন্যকে গোদাবরীতীরে বিখ্যাত জ্ঞানী ও ভক্ত রামানন্দ রায়ের সঙ্গে দেখা করিতে বলিয়া দিলেন। প্রথম দিন চৈতন্যদেব আলালনাথ গ্রামে পৌছিলেন, তথায় ভক্তগণের সঙ্গে সমস্ত রাত্রি হরিগুণ-কীর্ত্তন করিয়া প্রভাত হইবামাত্র আবার দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রেমমত্ত, নিস্পৃহ ও ত্যাগপর চৈতন্যদেবের

পথ ভ্রমণে ক্লান্তি নাই; কেবল উচ্চরবে হরিনাম গান করিতে করিতে কত দেশ, কত গ্রাম, কত নদী অতিক্রম করিয়া গেলেন কিছুই জ্ঞান নাই; অনন্তভক্তিতে উন্মত্ত হইয়া অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন ভ্রমণের পর তিনি গোদাবরী-তীরে উপস্থিত হইলেন; সার্ব্বভৌম তাঁহাকে এই স্থানে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে দেখা করিতে বলিয়া দিয়াছেন ইহা তাঁহার মনে সর্ব্বদাই জাগরূক ছিল। প্রকৃতির মনোহর দৃশ্যে তিনি আপনাকে ভুলিয়া যাইতেন এবং দেবালয় দেখিলে তাঁহার ভক্তি উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। গোদাবরী তীরে উপস্থিত হইয়া চৈতন্যদেব কৃষ্ণদাসকে বলিলেন আজ এইখানেই অপেক্ষা করা যাউক। এই বলিয়া তিনি পুণ্যসলিলা গোদাবরীতে স্নান করিয়া নদীতীরবর্ত্তী এক নিভৃত স্থানে হরিনাম গান করিতেছেন, এমন সময়ে রামানন্দ রায় মহাসমা-রোহে দোলায় চড়িয়া স্নান করিবার জন্য নদীতীরে আসিলেন। চৈতন্য দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে ইহাঁর নামই রামানন্দ। তাঁহার প্রাণ এত ব্যাকুল হইয়া উঠিল যে তিনি দৌড়িয়া গিয়া রামানন্দকে পবিত্র অনুরাগে আলিঙ্গন করেন কিন্তু রামানন্দ রায় নদীতীরে সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তাঁহার নিকট পরিচিত হইবার ইচ্ছায় দোলা হইতে অবতরণ করিয়া চৈতন্যের নিকট আসিতে লাগিলেন। উভয়ে একত্র হইবামাত্রই পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন। রামানন্দের অনুচরবর্গ দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিল।

অনেক প্রকার শিষ্টালাপের পর স্নান করিয়া রামানন্দ রায় গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই দিন সন্ধ্যার সময় এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে উভয়ের দেখা হইল; ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মাদ্বয়ের ধর্ম্মালোচনা আরম্ভ হইল। চৈতন্য বলিলেন ভক্তি, প্রেম ও তাহার সাধন সম্বন্ধে কিছু বল আমি শুনিয়া পরিতৃপ্ত হই।

রামানন্দ বলিলেন, বিষ্ণুভক্তিই সকলের সার; চৈতন্য বলিলেন পরমার্থ লাভের জন্য ইহা ব্যতীত আর কোন সাধন আছে কিনা? রামানন্দ বলিলেন ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করাই শ্রেষ্ঠ সাধন। চৈতন্য বলিলেন ইহা বাহিরের কথা, তার পর কি সাধন আছে বল। রামানন্দ বলিলেন স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভক্তি সাধন করাই সার। চৈতন্য বলিলেন ইহাও বাহিরের কথা, আর কি আছে বল। রামানন্দ বলিলেন জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই সাধনের সার। চৈতন্য বলিলেন আর কি সাধন আছে বল, রামানন্দ বলিলেন জ্ঞানশূন্য ভক্তি। চৈতন্য আবার জিজ্ঞাসা করিলেন আর কি সাধন আছে? রামানন্দ বলিলেন প্রেম ভক্তিই সাধনের সার। এইরূপ আলোচনা হইতে হইতে ক্রমে ক্রমে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য এই পঞ্চবিধ রসের অবতারণা হইল। পরিশেষে মহাভাবই প্রেমের চরম অবস্থা এবং ইহা অপেক্ষা আর কোন উন্নত সাধন নাই ইহাই সিদ্ধান্ত হইল।

রামানন্দ রায় জিজ্ঞাসা করিলেন আমি উপাসনার কিছুই

জানি না, কি প্রকারে হরিকে ভজনা করিতে হয়, কি কায করিলে তাঁহাতে অনুরক্তি জন্মে তাহাই বলুন। চৈতন্য বলিলেন সাধনা দুই প্রকার—ঈশ্বরে অর্পিত কার্য্য এবং অনুরাগ। সকর্ম্ম প্রেমীর সাধনা উৎকৃষ্ট এবং অকর্ম্ম প্রেমীর উপাসনা অঙ্গহীন বলিয়া জানিবে, এই জন্যই কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নিষ্কাম ভাবে ধর্ম্মাচরণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। মানুষ যেমন দুই পদে নির্ভর করিয়া গমনাগমন করে পরমার্থাকাঙ্ক্ষী মহাপুরুষদিগেরও সেইরূপ প্রেম এবং কার্য্যকে প্রধান সাধন বলিয়া তাহাতে নির্ভর করিতে হইবে। উভয় সাধনের একটীর অভাব হইলে উপাসনা পূর্ণাঙ্গ হয় না। নিষ্কাম ভাবে ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে হইলে বৈরাগ্যই ম ফলাভের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধন। প্রকৃত বৈষ্ণব হইতে হইলে বৈরাগ্য আশ্রয় করিতে হইবে; দণ্ড ধারণ, সংসারত্যাগ, বাঘাম্বর পরিধান, দণ্ডাশ্রমে বাস প্রভৃতি কিছুই বৈরাগ্যের সাধন নহে, কেন না কেবল মার্জ্জিত মনেই বৈরাগ্যের উদয় হইয়া থাকে এবং বিষয়ে বিরাগ, আত্মার উৎকর্ষ, জ্ঞানে অনুরাগ, ঈশ্বরে আত্মদান, নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য পালন ও সৎকর্ম্ম প্রেমের সহিত স্রষ্টার সাধনই বৈরাগ্যের লক্ষণ। লোকে সর্ব্বদাই "ত্যাগ" শব্দ লইয়া মহা আন্দোলন করিয়া থাকে কিন্তু ত্যাগ শব্দে বৈরাগ্য বুঝায় না কেবল মাত্র বৈরাগ্যের অঙ্গ বুঝায়। বুধগণ ত্যাগ শব্দ দুই অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন একটী লিপ্সার অভাব ও অন্যটী সংসারবর্জ্জন, কিন্তু লোকে

অভিজ্ঞান দোষে সংসার ত্যাগ করিয়া বনে অবস্থান করে এবং বৈরাগী বলিয়া পরিচয় দেয়। জনকাদি মহাজন গৃহাশ্রমে থাকিয়াই বৈরাগ্য ধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন, গৃহী হইয়া যিনি শুদ্ধ চিত্তে বৈরাগ্যধর্ম্ম পালন করিতে পারেন তিনিই মহাজন-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদ অধিকার করেন। কৃষ্ণের স্বরূপ, বিলাস মহত্ব ও ভক্তি সম্বন্ধে অনেক কথা হইলে চৈতন্য রামানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় চাহিলেন। ভক্তের হৃদয় ভক্ত পাইলে তাহাকে সহজে দূরস্থ করিতে চাহে না; অনেক দিন হইতে রামানন্দ চৈতন্যের প্রগাঢ় ভক্তির কথা শুনিয়া আসিতে-ছিলেন; সার্ব্বভৌমের অনুগ্রহে আজ তাঁহাকে আলয়ে পাইয়া-ছেন কেমন করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাকে বিদায় দিবেন? রামানন্দ রায়ের ব্যাকুলতায় চৈতন্যকে তথায় আরো কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইল। ভক্তদ্বয় প্রাণ মন খুলিয়া হরিগুণ গানে দিন কাটাইতে লাগিলেন। সে সময়ে দাক্ষিণাত্যে শৈবধর্ম্মের বিশেষ প্রবল ছিল কাজেই চৈতন্যকে অনেক পণ্ডিতের সহিত তর্ক করিতে হইয়াছিল; কোন প্রকার তর্কেই তিনি নিরুত্তর হইতেন না। চৈতন্য যখন হরিগুণ গানে মত্ত হইয়া পাগলের ন্যায় কাঁদিতেন তখন অনেক লোকে তাঁহার ধর্ম্মে মুগ্ধ হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিত। চৈতন্য কেবলমাত্র গোদাবরী তীরে দশ দিন ছিলেন এই অল্পকালের মধ্যেই দাক্ষিণাত্যে তাঁহার অসংখ্য শিষ্য হইয়া উঠিল। তিনি তথায় আর

অপেক্ষা না করিয়া রামানন্দকে বলিয়া গেলেন তুমি প্রবৃত্ত হইয়া নীলাচলবাসী হও আমি সত্বরেই দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিয়া তোমার সঙ্গী হইতেছি।

রামানন্দের নিকট বিদায় হইয়া চৈতন্যদেব হরিনাম প্রচার করিতে করিতে মাদ্রাজ প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তিনি কখনবা সাগরের ধার দিয়া কখনবা নদীর গতি লক্ষ্য করিয়া চলিতেন; প্রকৃতির কোলে শয়ানমান নদীর দৃশ্য তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। তিনি যেখানে নদী দেখিতেন সেইখানেই স্নান করিয়া হরিনাম গান করিতেন; তাঁহার বিশ্বাস ছিল নদীসিক্ত প্রদেশ সমূহেই হরিনাম কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। মাদ্রাজ প্রদেশে বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগের সহিত তাঁহার ঘোরতরতর্ক চলিতে লাগিল, একে একে সকলেই পরাস্ত হইলেন। বৌদ্ধেরা এই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য এক পাত্র উচ্ছিষ্টান্ন প্রসাদ বলিয়া তাঁহাকে দিতে আইসে। পথি-মধ্যে একটী চিল আসিয়া উচ্ছিষ্টান্নের পাত্র বৌদ্ধাচার্য্যের মস্তকে নিক্ষেপ করে; সকলেই এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইয়া রহিল এবং চৈতন্য যে একজন সিদ্ধার্থ মহাপুরুষ ইহা তাহাদিগের বিশ্বাস জন্মিল! এই অন্যায় ব্যবহারের জন্য পরি-শেষে বৌদ্ধগণ দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে; অনেকে বৈষ্ণবধর্ম্মও অবলম্বন করে।

মাদ্রাজ প্রদেশে ত্রিপদী, শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী, ত্রিমল্ল,

পঞ্চতীর্থ, বৃদ্ধকাল তীর্থ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া চৈতন্য-দেব কাবেরী নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। কাবেরীতে স্নান করিয়া শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে* দেবালয় দর্শন করিলেন; এই স্থানে বেঙ্কট ভট্ট নামে একজন পরম বৈষ্ণবের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। বেঙ্কট ভট্ট চৈতন্যকে নিজ আলয়ে লইয়া গিয়া যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন, এই স্থানে চৈতন্যদেব হরিনাম প্রচার করিবার জন্য চারিমাস বাস করেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে দক্ষিণাঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম্মের এত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল যে আজ পর্য্যন্তও তাহার প্রভাব বর্ত্তমান আছে। মানুষেও মানুষকে পূজা করিয়া থাকে; এই পূজা দুই প্রকার—অবতারে মানুষ পূজা ও কুমারীতে নারী পূজা। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে এরূপ পূজা আজ পর্য্যন্তও প্রচলিত আছে; বঙ্গদেশের ন্যায় দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থানেও চৈতন্যদেব অবতার স্বরূপে পূজিত হইয়া থাকেন।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বেঙ্কট ভট্টের সহিত চারিমাস অতিবাহিত করিয়া চৈতন্যদেব দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শিষ্যগণ মাত্রেই তাঁহার অনুগমন করিবার ইচ্ছা জানাইল কিন্তু তিনি কেবল কৃষ্ণদাস ব্যতীত কাহাকেও সঙ্গে লইলেন না। এইরূপে হরিনাম প্রচার করিতে করিতে তিনি শ্রীশৈল, কামকোষ্ঠী, দক্ষিণ মথুরা, মহেন্দ্রশৈল, সেতুবন্ধ, পাণ্ডুদেশ, চিয়ড়তালা,

* বর্ত্তমান ত্রিচিনপোলি অর্থাৎ ত্রিশির পল্লীর সন্নিহিত।

তিলকাঞ্চী, পানাগড়ি, মলয়পর্ব্বত, কন্যাকুমারী ভ্রমণ করিয়া মল্লার দেশে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে তিনি "ব্রহ্মসংহিতার" কতিপয় অধ্যায় পাইয়াছিলেন; যেখানে যে গ্রন্থ ভাল দেখিতেন তাহাই সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন এবং অবকাশ পাইলে পাঠ করিয়া শিষ্যগণকে শুনাইতেন। সিদ্ধান্ত শাস্ত্রের সারগ্রন্থ "ব্রহ্মসংহিতা" পাইয়া চৈতন্যদেব অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন এবং পরে ব্রহ্মদেশে ঐ শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলতত্ব সংস্থাপন করেন; বোম্বাই প্রদেশে ফল্গু, পঞ্চাপ্সরা, সুপারক, কোলাপুর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিতে করিতে মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত তাঁহার দেখা হইল। শ্রীরঙ্গপুরী নবদ্বীপ দেখিয়াছিলেন, এবং চৈতন্যের অগ্রজ বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণের বিষয়ও অবগত ছিলেন। চৈতন্যের পরিচয় পাইয়া পূর্ব্বকথা বলিতে লাগিলেন এবং এই তীর্থে যে বিশ্বরূপের গুরু শঙ্করারণ্য সিদ্ধার্থ হয়েন তাহাও বলিলেন। এইরূপ পরিচয়ে উভয়ের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব জন্মিল; কিছুকাল উভয়েই ধর্ম্মালাপে একত্র থাকিয়া দ্বারকাতীর্থ দর্শনে গমন করিলেন। এইস্থানে বৈষ্ণবগণের মুখে কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নর্ম্মদা ও তাপীনদীতে স্নান করিয়া মহেশ্বতীপুর, ঋষ্যমুখ, দণ্ডকারণ্য, পঞ্চবটী, নাসিক, ত্র্যম্বক, ব্রহ্মগিরি, কুশাবর্ত্ত প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া গোদা-

বরী তীরে রামানন্দ রায়ের বাসস্থান বিদ্যানগর গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। রামানন্দ রায়ের সঙ্গে দুইদিন হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া চৈতন্যদেব নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন এবং অনুচর কৃষ্ণদাসকে তাঁহার আগমন বার্ত্তা জানাইবার জন্য নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন। নীলাচলবাসী ভক্তগণ চৈতন্যকে পাইয়া মহানন্দে হরিগুণ গান করিতে লাগিল। এদিকে কৃষ্ণদাসের মুখে চৈতন্যের প্রত্যাগমনের সংবাদ পাইয়া গৌড়ীয় ভক্তগণ জগন্নাথক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। ভক্তসম্মিলনে পুরী পবিত্র হইল; চতুর্দ্দিকেই হরিনাম গান হইতে লাগিল; ক্রমে ক্রমে ভক্তির মাহাত্ম্য এত বিস্তৃত হইয়া পড়িল যে পুরীর রাজা প্রতাপ রুদ্র চৈতন্যদেবের শিষ্য হইবার জন্য আন্তরিক ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌমও রাজার অনুকূলে চৈতন্যের নিকট ভক্তি ভিক্ষা চাহিলেন কিন্তু চৈতন্য সর্ব্বদাই বলিতেন আমি সন্ন্যাসী, বিষয়ে বিরাগই আমার ধর্ম্ম সুতরাং রাজদর্শন আমার পক্ষে নিষিদ্ধ; স্ত্রী দর্শন করিলে যে পাপ হয় রাজদর্শনেও সেই পাপে কলঙ্কিত হইতে হয়। প্রতাপ রুদ্র চৈতন্যের এই কথায় ভক্তিলাভে নিরাশ হইয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন তথাপিও তিনি চৈতন্যের নিকটস্থ হইতে পারিয়াছিলেন না।

ব্রহ্মানন্দ ভারতী নামে একজন নিরাকারবাদী ব্রহ্মচারি চৈতন্যের নিকট ভক্তি শিক্ষা করিয়া পরমবৈষ্ণব হইয়া উঠেন।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে চৈতন্য তাঁহাকে বলিলেন তোমার যেরূপ অনুরাগের ব্যাকুলতা তাহাতে বোধ হয় তুমি সর্ব্বদাই হরিকে দেখিতে পাও। সার্ব্বভৌম চৈতন্যকে নির্দ্দেশ করিয়া তারতীকে বলিলেন "ইহাঁর কৃপাতে ইহাঁর দর্শন হয়।" চৈতন্য এই কথা শুনিয়া বিষণ্ণভাবে বলিলেন "অতিস্তুতি নিন্দায় পরিণত হয়।" ইহাতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে তিনি কাহারও অবতার নহেন; লোকে তাঁহাকে প্রশংসা ও দেবভাবে পূজা করে ইহা তিনি ভাল বাসিতেন না। ভগবানের অবতার বলিলে তাঁহাকে সগুণ বলিতে হয় এবং সগুণ বলিলে তাঁহাতে ব্যক্তিত্ব আরোপণ করা হয়; কিন্তু চৈতন্যদেব ব্যক্তিবিশেষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতেন না, তাঁহার নিজের মধ্যে যে এই শ্রেষ্ঠতা আছে একথা যাহার মুখে শুনিতেন তাহার প্রতি বিশেষ কষ্ট হইয়া বলিতেন আমি কোন গুণের জন্যই কাহারও পূজ্য নহি। মনুষ্যে ভগবানের সত্তা ও ভগবান এই দুইটী দুর্ব্বোধ্য ভাব সহজে মনুষ্যের বোধগম্য হয় না, এই জন্যই দুর্ব্বল মানুষ যখন যে কোন মানুষে দেবভাবের পূর্ণ-বিকাশ দেখিতে পায় তখনই তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া আত্মার তৃপ্তি সাধন করিয়া অবতারবাদীগণের মত সমর্থন করিতে থাকে। চৈতন্যদেব নিজ মুখে স্বীয় অবতার বাদের প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন; যখনই অদ্বৈত প্রমুখ ভক্তগণ চৈতন্যের গুণ কীর্ত্তন করিতেন তখন তিনি বলিতেন তোমরা আমাকে অন্যায়রূপে প্রশংসা করি-

তেছ, ধর্ম্মজীবনের কর্ত্তব্য সাধনে আত্মত্যাগ দেখাইলে যদি ভগবানের অবতার হওয়া যায় তাহা হইলে ভগবানে ও মনুষ্যে কি প্রভেদ থাকিল? এইরূপ উত্তরে সকলেই নিরুত্তর হইতেন। চৈতন্যদেবের অবতার সম্বন্ধে অনেক প্রকার মত আছে; বৈষ্ণবেরা তাঁহাকে ভগবানের পূর্ণাবতার বলিয়া অনন্ত-সংহিতার নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া থাকেন :—

"ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় বিহরিষ্যামি তৈরহং।
কালে নষ্টং ভক্তিপথং স্থাপয়িষ্যাম্যহং পুনঃ॥
কৃষ্ণশ্চৈতন্য গৌরাঙ্গো গৌরচন্দ্র শচীসুতঃ।
প্রভুর্গৌরহরি গৌরো নামানি ভক্তিদানি মে॥"

চৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত আছে :—

"ভগবান কৃষ্ণ বিষ্ণু পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥
নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোঁসাই॥"

বৈষ্ণবেরা চৈতন্যকে কৃষ্ণের অবতার জানিয়া প্রগাঢ় অনুরাগে তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রতিবাদী শাস্ত্রকারেরা বলেন বেদ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি আদিগ্রন্থে চৈতন্যের নামোল্লেখ নাই; কাজেই চৈতন্যকে তাঁহারা বিষ্ণুর কিম্বা কাহারও অবতার বলিয়া স্বীকার করেন না। এইরূপ মতবৈষম্যে চৈতন্য কাহারও অবতার কি না তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে।

গৌড়ীয় ভক্তগণের সঙ্গে চৈতন্যদেব প্রাণ মন খুলিয়া হরিনাম গান করিতে লাগিলেন। এরূপ লিখিত আছে যে তিনিই প্রথমে জগন্নাথ ক্ষেত্রে ছত্রিশ জাতির একত্র অন্নাহারের প্রথা প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। অনেকে বলেন তাঁহার অনেক পূর্ব্বে বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক এই পবিত্র ক্ষেত্রে এই প্রথা প্রচলিত হয়। জগন্নাথক্ষেত্রে যে এক সময়ে বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম-যাজনার স্থান ছিল তাহার অনেক প্রমান পাওয়া যায়। বৌদ্ধেরা এখনও জগন্নাথ দেবকে বুদ্ধাবতার বলিয়া থাকেন। * যিনিই এই প্রথা স্থাপন করুন না কেন, চৈতন্যদেব যে নিজের ধর্ম্ম-মত্ততায় জাতি-বৈষম্য শিথিল করিয়াছিলেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। তিনি প্রকাশ্যরূপে কোন দিন জাতিভেদের অনুকূলে কোন কাযই করেন নাই; বরঞ্চ যাহা করিয়াছিলেন তাহাতে জাতিভেদের মূল বিচ্ছিন্ন করিবার বিশেষ যত্ন পাইয়াছিলেন। ধর্ম্মানুষ্ঠানে সকলেই ন্যায়ানুসারে ক্ষমতাবান; সকলেই বিশ্বাসে ভক্তি, ও ভক্তিতে মুক্তি পাইতে পারে ইহা তাঁহার অটল বিশ্বাস। চণ্ডাল হউক ম্লেচ্ছ হউক সকলেই এ ধর্ম্মের আশ্রয়ে মুক্তি লাভ করিতে পারে। এরূপ লিখিত আছে যে তিনি পাঁচজন পাঠানকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন তজ্জন্যই——

* শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ১ম ভাগ ১২৯পৃষ্ঠা।

"পাঠান বৈষ্ণব বলি হইল তার খ্যাতি।
সর্ব্বত্র গাইয়া বলে মহা প্রভুর কীর্ত্তি॥"

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর অন্ন গ্রহণ কালে জাতিভেদের বিরুদ্ধে কৃষ্ণদাস যাহা লিখিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। জাতিভেদের কথা হইলে চৈতন্যদেব বলিতেন :—

শুচি সদ্ভক্তি দীপ্তাগ্নি দগ্ধদুর্জাতি কল্মষঃ।
শ্বপাকোঽপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যোন বেদজ্ঞোঽপি নাস্তিকঃ॥

আরও বলিতেন বেদজ্ঞ পণ্ডিত হইলেই আমার ভক্ত হয় না, চণ্ডাল যদি ভক্ত হয়, তাহা হইলে সেই আমার প্রিয়। তাহাকেই দান করিবে ও তাহার দান লইবে কেননা সে আমার ন্যায় পূজ্য। এইরূপ নানা কারণে অনেকে বলেন তিনি জাতিভেদ স্বীকার করিতেন না; আবার কেহ কেহ বলেন তিনি সকল সম্প্রদায়কেই নিজের ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন কিন্তু আহার বিষয়ে জাতি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া চলিতেন। যবন হরিদাস যখন চৈতন্যকে দেখিবার জন্য পুরীক্ষেত্রে আগমন করেন তখন তিনি পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন না; পুরীর বাহিরে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। চৈতন্যের সহবাসে বঞ্চিত হইয়া হরিদাস দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু চৈতন্যদেব প্রত্যহই একবার করিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতেন এবং উভয়েই ভাবে মত্ত হইয়া হরিগুণ কীর্ত্তন করিতেন।

গৌড়ীয় ভক্তগণের সঙ্গে মহানন্দে হরিনাম গান করিয়া

তাহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাগত হইতে বলিলেন; নিজেও গৌড় দর্শন করিয়া বৃন্দাবনযাত্রা করিবার মানসে পুরীস্থ ভক্তগণের নিকট বিদায় হইলেন। চৈতন্যদেব কটকে আসিলেন তত্রত্য রাজা প্রতাপ রুদ্র তাঁহাকে নিরাপদে বঙ্গদেশে পৌঁছিবার জন্য সঙ্গে কতিপয় লোক দিলেন। আত্মরক্ষার জন্য তিনি কেবল হরিনাম সহায় করিয়া পথিমধ্যে প্রতাপ রুদ্রের লোকদিগকে বিদায় দিয়া পানিহাটীগ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথায় সার্ব্ব-ভৌমের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির আলয়ে হরিকীর্ত্তনে মত্ত হইয়া উঠিলেন। চৈতন্যদেব বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন এসংবাদে বাঙ্গালায় আর লোক থাকিল না; সকলেই চৈতন্যকে দেখিবার জন্য পানিহাটী গ্রামের দিকে ছুটিতে লাগিল; পানিহাটীগ্রাম লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। নবদ্বীপ হইতে দলে দলে ভক্তগণ চৈতন্যকে দেখিবার জন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল; চৈতন্যের আর বিশ্রাম নাই; যিনি দেখা করিতে আইসেন তাহাকেই তিনি আলিঙ্গন করিয়া আধ্যাত্মিক কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি দেখিলেন আর কিছুদিন এইস্থানে অপেক্ষা করিলেই সন্ন্যাস ধর্ম্মের কঠোর কর্ত্তব্য হইতে চ্যুত হইতে হইবে; এই মনে করিয়া কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া তিনি একদিন রজনীতে কুমারহট্ট (হালিসহর) গ্রামে পলায়ন করিলেন। তবুও লোক তাঁহাকে ছাড়িল না; তিনি যেখানে যান সেইখানে অসংখ্য নরনারী ছুটিয়া যায়; তাঁহাকে দেখিবার জন্য বঙ্গদেশের নর-

নারীপাগল হইয়া উঠিল। এদিকে চৈতন্য কুমারহট্ট হইতে কাঁচড়াপাড়ায় শিবানন্দের সঙ্গে দেখা করিয়া কুলিয়াগ্রামে মাধবদাসের বাটীতে এক সপ্তাহকাল থাকিলেন। প্রেমমত্ত চৈতন্য যেমন বঙ্গদেশে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, ভক্তগণও আগ্রহাতিশয়ে তাঁহার পাছে পাছে বেড়াইতে লাগিল। হরিনামের কোলাহলে বঙ্গদেশ কাঁপিয়া উঠিল; শৈব, সৌর ও গাণ-পত্য ধর্ম্ম লোপ পাইবার উপক্রম হইল। যিনি একবার চৈতন্যের প্রেমের ব্যাকুলতা দেখিতেন তিনি আর উদাস না হইয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারিতেন না। কুলিয়াগ্রাম হইতে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের আলয়ে শচীদেবীর সহিত দেখা করিয়া নৌকাযোগে ভাগীরথীর বক্ষে ভাসিতে ভাসিতে চৈতন্যদেব রামকেলীগ্রামে উপস্থিত হইলেন। নদীর স্রোতের ন্যায় অসংখ্য ভক্তগণ তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল; নির্জ্জনে বসিয়া যে তিনি এক মুহুর্ত্তের জন্য স্থিরচিত্তে হরিনাম করিবেন এ অবসরও তাঁহার ছিল না। তিনি যেখানে যাইতে লাগিলেন সেই স্থানেই দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্মালাপ করিতে লাগিলেন; মিষ্টভাষী চৈতন্যের সহিত একবার যিনি আলাপ করিতেন তিনি আর জীবনে তাঁহাকে ভুলিতে পারিতেন না। চৈতন্যদেব হরিনাম গান করিতে করিতে প্রাচীন রাজধানী গৌড়নগরে (রামকেলী গ্রামে) উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে সৈয়দ হোসেন শাহা বাঙ্গালা, বেহার

উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশ হস্তগত করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে আধিপত্য করিতে ছিলেন। যখন উড়িষ্যার অধিপতি প্রতাপ রুদ্রের সহিত হোসেন শাহার ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছিল তখন ইস্‌লামধর্ম্মের অত্যাচারে হিন্দুধর্ম্ম সংকীর্ণ হইয়াছিল। এই ভয়ানক রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে চৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে বঙ্গদেশ আলোড়িত করিয়া তুলেন। তাঁহার আগমনে রাম-কেলীগ্রামে হরিনামের কোলাহল উঠিল; শূদ্র, যবন, চণ্ডাল সকল জাতিই এক হইয়া হরিনামগানে পাগল হইল। হোসেন শাহা দেখিয়া শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন; নগর রক্ষকগণের মুখে চৈতন্যের অলৌকিক মহিমার কথা শুনিয়া তিনি আর বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচারের প্রতিবাদী হইলেননা, বরঞ্চ অধীনস্থ কর্ম্মচারী দিগকে বলিয়া দিলেন নবাগত সন্ন্যাসীর যাহা ইচ্ছা তাহাই তিনি করিতে পারেন। হোসেন শাহার মনও চৈতন্যের গুণের পক্ষপাতী হইয়াছিল। যবনের রাজধানীতে হিন্দুধর্ম্মের আলো-চনা হইতেছে, নিশ্চয়ই ইহার জন্য শাস্তি পাইতে হইবে এই ভয়ে অনেকে স্থানান্তরিত হইবার পরামর্শ দিলেন কিন্তু তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া নির্ভয়ে হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। কানাইনাট্টশালে রূপ ও সনাতনের সহিত চৈতন্যেরপ্রথম দেখা হয়; ভ্রাতৃদ্বয় বিনীতভাবে তাঁহার নিকট ভক্তি ভিক্ষা করিলে তিনি বলিলেন তোমরা যেরূপ দীন হইয়া ভক্তির সাধনায় মত্ত হইয়াছ তাহাতে অচিরাৎ হরিভক্তি

লাভ করিতে পারিবে ; বিষয় বাসনা ত্যাগ করিয়া একান্তচিত্তে হরির চরণে আত্মসমর্পণকর তাহাহইলে তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। এই বলিয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে বিদায় দিয়া শান্তিপুরে ফিরিয়া আসিলেন। এদিকে শচীদেবী পুত্রকে দেখিবার জন্য শান্তিপুরে আসিলেন ; অনেক দিনের পর মাতা ও পুত্রে একত্রিত হইলেন। শচীদেবী নিজ হস্তে নানাপ্রকার ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া মনের সাধে পুত্রকে খাওয়াইলেন। চৈতন্য এবারে শান্তিপুরে কেবলমাত্র দশদিন ছিলেন ; সমস্ত সময়ই হরিনামকীর্ত্তন করিয়া আনন্দে নাচিতেন এবং ভক্তগণের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করিতেন। সন্ন্যাসী হইয়া যখন তিনি প্রথমবার শান্তিপুরে অবস্থান করেন তখন সপ্তগ্রামবাসী লক্ষপতি গোবর্দ্ধনদাসের পুত্র রঘুনাথের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। রঘুনাথ চৈতন্যের বিষয়ে বিরাগ, প্রেমোন্মত্ততা উদাসীন ভাব দেখিয়া বৈরাগ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার চেষ্টা করেন ; কিন্তু পিতার শাসনে তিনি এ পর্য্যন্ত সফলকাম হইতে পারেন নাই। চৈতন্য নীলাচলে গমন করিলে তিনি প্রেমে উন্মত্ত হইয়া উঠেন কাজেই তাঁহার পিতা তাঁহাকে আলয়ে রাখিবার জন্য প্রহরী নিযুক্ত করেন। ভক্তের প্রাণ যেখানে ভক্তের সমাগম হয় সেইখানে ছুটিয়া যাইতে চায়, তাহাকে বাঁধিয়া রাখিলেও যতদিন না সে ভক্তির পূর্ণসঞ্চার অনুভব করিতে পারিবে ততদিন ছুটিয়া যাইতে চেষ্টা করিবে। এবারে শান্তিপুরে উপস্থিত হইলে

রঘুনাথ পিতার অনুমতিক্রমে চৈতন্যের সহিত দেখা করিতে আসিলেন এবং তাঁহার সঙ্গী হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চৈতন্য তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন তুমি আরো কিছু দিন অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ কর, যখন আমি বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে গমন করিব তখন আমার সঙ্গী হইও। রঘুনাথ চৈতন্যের কথায় আশ্বস্ত হইয়া কেবলমাত্র তাঁহার প্রত্যাগমনের অপেক্ষায় মনের দুঃখে দিন কাটাইতে লাগিলেন। এইরূপে চৈতন্যদেব প্রেম-প্লাবনে বঙ্গদেশ ভাসাইতে লাগিলেন; চতুর্দ্দিকই হরিনামের ধ্বনিতে ধর্ম্মরাজ্যের বিজয় ঘোষণা করিতে লাগিল। শান্তিপুর হইতে বিদায় হইয়া তিনি আবার কুমারহট্টে তথা হইতে পানিহাটিগ্রামে রাঘবপণ্ডিতের আলয়ে আসিলেন। ধর্ম্মপ্রচারের জন্য নিত্যানন্দকে এই স্থানে স্থাপিত করিয়া বরাহনগরে উপস্থিত হইলেন। শান্তিপুর হইতে বিদায় কালে সকলকে বলিয়া আসিলেন এবারে তোমরা কেহ শ্রীক্ষেত্রে আসিবেনা কেননা আমি বৃন্দাবন যাত্রাকালে অনেক দিন দেশে দেশে বেড়াইব।

চৈতন্যের আদেশে নিত্যানন্দ পানিহাটীগ্রামে ধর্ম্মপ্রচারের প্রধান আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন। অমিতবল নিত্যানন্দ তথায় কিছুদিন অসীম উৎসাহে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া প্রথমে খড়দহে পরে সপ্তগ্রামে উদ্ধরণ দত্তের বাটীতে উপস্থিত হন; এই হইতে সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিক সম্প্রদায় বৈষ্ণবদিগের মধ্যে প্রধান স্থান

পায়। সপ্তগ্রাম হইতে নিত্যানন্দ শান্তিপুর, নবদ্বীপ, বড়গাছি, দোগাছিয়া প্রভৃতি স্থানে হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। দলে দলে লোক আসিয়া নিত্যানন্দের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। বড়গাছির নিকট সালিগ্রামে পণ্ডিত সূর্য্যদাস সরখেল নামে একজন ধর্ম্মপরায়ণ লোক ছিলেন, তিনি নিত্যানন্দের গুণে মুগ্ধ হইয়া নিজের বসু ও জাহ্নবা নাম্নী দুইটী কন্যাকে তাঁহার সঙ্গে বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন। বৈষ্ণবগণ এসংবাদে আনন্দ প্রকাশ করিয়া নিত্যনন্দকে উক্ত কন্যাদ্বয়ের পাণিগ্রহণ করিতে সম্মত করাইলেন। শুভদিনে নিত্যানন্দ বসু ও জাহ্নবাকে বিবাহ করিয়া নবদ্বীপে প্রত্যাগত হইলেন। শচীদেবী নববধূদ্বয়কে পাইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

এদিকে চৈতন্যদেব নীলাচলে উপস্থিত হইয়া বৃন্দাবনযাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। উড়িষ্যাবাসীগণ আবার চৈতন্যকে পাইয়া গভীর নিনাদে হরিনাম গানে মত্ত হইল। তিনি এবারে নীলাচলে কেবলমাত্র চারিমাস কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। রামানন্দের নিকট বিদায় লইয়া বলভদ্র ভট্টা-

চার্য্য নামক একজন সচ্চরিত্র সাধুকে সঙ্গে করিয়া বনপথে বৃন্দাবনযাত্রা করিলেন। বনে বনে সুকণ্ঠস্বরে হরিনাম গান করিতে লাগিলেন; নিবিড় বনে হিংস্রক জন্তুরা সর্ব্বদাই বিচরণ করিতেছে তাহাতে তাঁহার ভয় নাই, পথভ্রমণে পরিশ্রম নাই, ক্ষুৎপিপাসায় উৎকণ্ঠা নাই। এইরূপে কত দেশ, কত নদী, কতগ্রাম অতিক্রম করিয়া গেলেন; বলভদ্র নীরবে তাঁহার গতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে নির্ম্মল সলিলা নদী দেখিলে তিনি আর চলিতেন না; তথায় স্নান করিয়া তীরে হরিনাম গান করিতেন। লোকে তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিয়া উদাস ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিত; তিনি কেবল হরিকে নির্দ্দেশ করিয়া সকল কথারই উত্তর দিতেন। হরি-নামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে করিতে নিজে প্রেমে বিহ্বল হইয়া রোদন করিতেন। পথিমধ্যে ঝারিখণ্ড গ্রামে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য অসভ্য অধিবাসীদিগকে ভক্তিশিক্ষা দিয়া অনেককে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। মহাপুরুষেরা যেখানে যান সেখানেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য দেখিতে পান; এ কর্ত্তব্য যতদিন না সম্পন্ন হয় ততদিন তাঁহাদের মন নিশ্চিন্ত থাকে না। বনে বনে বেড়াইয়া অবশেষে চৈতন্যদেব কাশীতে উপস্থিত হইলেন; তথায় মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিয়া তীরে বসিয়া হরিনাম গান করিতেছেন এমন সময়ে পূর্ব্ব পরিচিত তপন মিশ্র আসিয়া তাঁহাকে নিজের আলয়ে লইয়া গেলেন।

তথায় চন্দ্রশেখর আচার্য্যের সহিত তাঁহার দেখা হইল। এই স্থানে প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক পণ্ডিত প্রকাশানন্দের সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার সামান্য আলাপ হয়। প্রয়াগে তিন দিন অবস্থান করিয়া তিনি বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। এইখানে কৃষ্ণদাস নামে একজন রাজপুত চৈতন্যের গভীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গে বৈরাগ্য-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। চৈতন্যদেব একে একে বলভদ্র ও কৃষ্ণদাসের সাহায্যে কৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবনের সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান পরিদর্শন করিলেন। লোকমুখে চৈতন্যের আগমনবার্ত্তা দেশময় হইয়া উঠিল; এত জনতা হইল যে তিনি বাধ্য হইয়া প্রয়াগে ফিরিয়া আসিলেন। পথিমধ্যে একদিন প্রেমে অচেতন হইয়া বৃক্ষতলে পড়িয়া রহিয়াছেন; পার্শ্বে বলভদ্র ও কৃষ্ণদাস বিষণ্ণমুখে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময়ে দশজন অশ্বারোহী পাঠান তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই চৈতন্যকে মৃতপ্রায় দেখিয়া স্থির করিল যে এই দুই জন লোক তাঁহার সর্ব্বস্ব লইবার জন্য তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়াছে পরে হত্যা করিবে। এই স্থির করিয়া পাঠানগণ বলভদ্র ও কৃষ্ণদাসকে বাঁধিতে আরম্ভ করিল; তাহারা দুইজনে অনন্যোপায় হইয়া কাতরস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। চৈতন্য সহসা উঠিয়া দেখিলেন মহাবিপদ; ভক্তদ্বয় নিশ্চয়ই দস্যুর হস্তে প্রাণ হারাইবে; তখন তিনি কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বিনীতভাবে পাঠানদিগকে বলিলেন

দেখ ! ইহারা দুইজন আমার অনুগত শিষ্য ও নিতান্ত সচ্চরিত্র, ইহাদিগকে প্রাণে মারিয়া তোমাদের কিছুই লাভ হইবে না। এই কথা শুনিয়া পাঠানগণ চৈতন্যের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ এইরূপ ভাবে থাকিয়া বলিল তোমার সর্ব্বস্ব লইবার জন্য যে ইহারা দুইজনে তোমাকে হত্যা করিবার চেষ্টা পাইতেছিল তজ্জন্যই আমরা ইহাদিগকে বাঁধিয়াছি। চৈতন্য তখন বলিলেন আমার সঙ্গে এমন কিছুই নাই যে তাহাতে ইহাদের লোভ হইবে; বিশেষতঃ অনেক দিন হইতে ইহারা আমার শিষ্য হইয়াছে, আমি ইহাদিগকে বিশেষরূপে জানি। পাঠানগণ চৈতন্যের কথায় বলভদ্র ও কৃষ্ণদাসের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়া স্থিরনেত্রে তাঁহার প্রশান্তমূর্ত্তি দেখিতে লাগিল। ভক্তির জীবন্ত-মূর্ত্তি দেখিয়া তাহাদের হৃদয় মুগ্ধ হইয়া গেল; বিনীতভাবে করযোড়ে চৈতন্যের নিকট ভক্তি-ভিক্ষা করিল। কি চণ্ডাল, কি যবন, কি শূদ্র সকলকেই ভক্তি-শিক্ষা দিবার জন্য চৈতন্যের প্রাণ নাচিয়া উঠিল; ঘন ঘন হরিনাম উচ্চারণ করিয়া প্রাণের সঙ্গে পাঠানদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। নির্জ্জনপ্রান্তরে ভক্তির জয় হইল! লিখিত আছে এই পাঠানদিগের সর্দার বিজলীখাঁও চৈতন্যের শিষ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল; ইহাদিগকে অন্যান্য বৈষ্ণবেরা পাঠানবৈরাগী বলিয়া থাকে। চৈতন্যদেবের উদারতার জ্বলন্ত সাক্ষ্য এই ভূতলে রহিয়া গেল।

কানাইনাট্টশালে রূপ ও সনাতনের সহিত চৈতন্যের প্রথম দেখা হয়। রূপ সনাতন উচ্চব্রাহ্মণবংশসম্ভূত; ইহাঁরা পূর্ব্বে রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন। ইঁহাদিগের পিতামহ পদ্ম-নাভ জন্মভূমি কর্ণাটরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে (নব-হট্টে) নৈহাটীতে বাস করিতে থাকেন। এই স্থানে রূপ, সনা-তন ও বল্লভ (ইঁহার অন্য নাম অনুপম) জন্ম গ্রহণ করেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করার পূর্ব্বে তিন ভাই গৌড় নগরে যবনরাজা-দিগের উজির ছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের বিষয়ে বিরাগ ও প্রেমে অনুরাগ জন্মে; ক্রমে ক্রমে এই বিরাগ বদ্ধমূল ও অনুরাগ দৃঢ়তর হইলে, চৈতন্যের দৃঢ়ভক্তির কথা শুনিয়া তাঁহারা কানাইনাট্টশালে তাঁহার সহিত দেখা করেন। আলয়ে আসিয়া কেহই নিশ্চিন্তভাবে থাকিতে পারিলেন না; চৈতন্য নীলাচলে গমন করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য তথায় লোক পাঠইলেন। আবার যখন শুনিলেন যে তিনি প্রয়াগে অবস্থিতি করিতেছেন, তখন রূপ ও অনুপম দুই জনে সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া সত্বরপদে তথায় উপস্থিত হইলেন। তখনও সনাতনের বিষয়ে বিরাগ জন্মায় নাই; তিনি তখনও যবনরাজাদিগের দাসত্ব কার্য্য ত্যাগ করিতে পারেন নাই। রূপও অনুপম যখন ভক্তিতে পাগল হইয়া চৈতন্যের উদ্দেশে গৃহত্যাগী হইল, তখন তাঁহার মনে ঘৃণা জন্মিল ও সংসারভোগে বীতস্পৃহ হইতে লাগিলেন। সহসা উজিরিপদ ত্যাগ করিলে

যবনের হাতে অপমান হইতে হইবে ভয়ে তিনি ক্রমে ক্রমে বৈষয়িক কার্য্য ত্যাগ করিতে লাগিলেন। পরে যখন উড়িষ্যা বাসীদিগের সঙ্গে যবনরাজের সংগ্রাম উপস্থিত হয় তখন তিনি উজিরিপদ ত্যাগ করিলেন। গৌড়াধিপতি এইরূপ ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখেন।

প্রয়াগে একদিন চৈতন্যদেব ভক্তিতে মত্ত হইয়া হরিনাম গান করিতেছেন এমন সময় রূপ ও অনুপম দন্তে তৃণ লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি রূপকে দেখিয়া সনাতনের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু পরে যখন শুনিলেন যে তিনি বন্দীভাবে দিন কাটাইতেছেন তখন বিষণ্ণভাবে বলিলেন অচিরাৎ তাহার সঙ্গে আমার দেখা হইবে। দশদিন প্রয়াগে অপেক্ষা করিয়া রূপকে ভক্তিশিক্ষা দিলেন; রামানন্দ রায়ের নিকট হইতে চৈতন্য যেরূপ ভক্তির সাধন শুনিয়াছিলেন রূপকেও তাহাই শিখাইলেন। রূপকে বৃন্দাবন দর্শনের উপদেশ দিয়া নিজে কাশীতে চলিয়া গেলেন।

সনাতন গৌড়েশ্বরের আদেশে বন্দী হইয়া এক প্রকার উন্মত্ত হইয়াছিলেন; পরে অনেক কৌশলে কারাধ্যক্ষকে সাত সহস্র মুদ্রা উৎকোচ দিয়া কারামুক্ত হইয়াছিলেন। কারাগার হইতে যে দিন মুক্তিলাভ করেন সেই দিনেই পুরাতন ভৃত্য ঈশানকে সঙ্গে লইয়া চৈতন্যের সঙ্গী হইবার মানসে কাশী যাইবার জন্য যাত্রা করেন। পথিমধ্যে পাটনার সন্নিহিত হাজিপুর গ্রামে

দস্যু হস্তে পতিত হন। ঈশানের সঙ্গে কয়েকটী স্বর্ণমুদ্রা ছিল দস্যুদল উহারই লোভে সনাতনকে আক্রমণ করে। তিনি আর কোন উপায় না দেখিয়া স্বর্ণমুদ্রা কয়েকটী ও সঙ্গে যাহা কিছু ছিল সকলই দস্যুগণকে দিয়া অব্যাহতি পাইলেন। পরে ঈশানকে বিদায় দিয়া একাকী বনপথে কাশীতে উপস্থিত হইলেন। এইখানে চৈতন্যদেব চন্দ্রশেখরের আলয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি ভক্তগণের সঙ্গে প্রেমে আকুল হইয়া হরিনাম গান করিতেছেন; এমন সময়ে সনাতন মলিন-বেশে দ্বারে আসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রেমিকের হৃদয় প্রেমিকের রোদনে সহজে গলিয়া যায়, যিনি জীবের দুঃখে নিজের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইয়াছেন তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্ম-প্রাণ ও দৃঢ়ভক্ত সনাতনের কাতরোক্তিতে কখনই স্থির থাকিতে পারে না। চৈতন্য বাহিরে আসিয়া দেখেন সনাতন আকুল-প্রাণে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছেন; তখন পবিত্র অনুরাগে ভক্তকে আলিঙ্গন করিলেন। অন্যান্য বৈষ্ণবগণ বাহিরে আসিয়া দেখেন তিনি একজন অপরিচিত উদাসীনের সঙ্গে আলিঙ্গন করিতেছেন। সকলেই গগণ বিদীর্ণ করিয়া সমস্বরে হরিবোল দিতে লাগিল। ভক্তের প্রাণ ভক্তির অবতারের প্রাণের সঙ্গে এক হইয়া গেল! এ পবিত্র ও অনুরাগপূর্ণ দৃশ্যে ভক্ত মাত্রেরই হৃদয় আকুলিত হইয়া উঠিল। চৈতন্যদেব কাশীতে আরও দুইমাস কাল বাস করিয়াছিলেন; এই সময়ের

মধ্যে তিনি কেবল সনাতনের ভক্তিসাধন সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। সনাতনকে যথোচিত রূপে ভক্তি, প্রেম ও সাধন বিষয়ে শিক্ষিত করিয়া চৈতন্যদেব একদিন তাঁহাকে বলিলেন আমি এখন নীলাচলে গমন করি, তুমি বৃন্দাবনে গিয়া রূপ ও অনুপমের সহিত দেখা কর। এই বলিয়া তিনি কাশীস্থ ভক্তগণের নিকট বিদায় হইয়া নীলাচলে যাত্রা করিলেন।

চৈতন্যদেব যে সময়ে কাশীতে ছিলেন সে সময়ে প্রকৃত বৈষ্ণব অতি অল্পই ছিল। তথায় প্রায় সকলেই ঘোর মায়াবাদী ছিলেন। কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের প্রাধান্য সকলেই স্বীকার করিতেন। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই স্থান পবিত্র তীর্থের ও সাধু সমাগমের জন্য ভারতবর্ষে বিখ্যাত। এই তীর্থ প্রতিপত্তির জন্য এখানে সৎ, অসৎ উভয়বিধ লোকেরই সমাগম হইয়া থাকে। দণ্ডী, সন্ন্যাসী এবং পরমহংসদিগের এরূপ নিরাপদ আশ্রয় আর কোথায়ও নাই। চৈতন্য যে সময়ে এখানে বাস করিয়াছিলেন সে সময়ে ইহার অবস্থা আরও মন্দ ছিল। তাঁহার চক্ষে এসকল পাপের দৃশ্য সহ্য হইত না; তিনি এরূপ স্থান দেখিলে প্রাণপণে উন্নতির জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেন। এক জন পরম ভক্ত কাশীর সমস্ত পণ্ডিতকে একটী সভায় নিমন্ত্রিত করেন, চৈতন্যও নিধিমতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কাশীতে আসা পর্য্যন্ত তিনি প্রায়ই মায়াবাদী পণ্ডিতগণের সভায় নিমন্ত্রিত হইলেও ইচ্ছাপূর্ব্বক উপস্থিত হইতেন না। এবারে নিজের

অনুগত শিষ্য কর্ত্তৃক সভা আহূত হইয়াছে মনে করিয়া সভায় উপস্থিত হইবার নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ তিনি মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার নিজের পাণ্ডিত্য ও দৃঢ়ভক্তি জনসমাজে প্রচারিত করিবার উদ্দেশ্যে এই সভা আহূত হইয়াছে। স্বীয় পাণ্ডিত্য ও দৃঢ়ভক্তি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা যে তাঁহার বলবতী ছিল এরূপ নহে; কেবল জ্ঞানকাণ্ডপর পণ্ডিতগণকে ভক্তির আবশ্যকতা বুঝাইবার জন্য এসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে চৈতন্যদেব সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া অলক্ষিতভাবে একপার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। কাশীর বিখ্যাত বৈদান্তিক পণ্ডিত প্রকাশানন্দ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে বসাইয়া তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানের বিষয় তাঁহাদিগকে বলিয়া দিলেন। কেহ কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিলনা দেখিয়া প্রকাশানন্দ নিজেই চৈতন্যকে বলিলেন দেখ! তুমি সন্ন্যাসী, বেদান্ত পাঠ ও ধ্যান করা তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, কিন্তু তুমি তাহা না করিয়া সর্ব্বদাই ভক্তগণের সঙ্গে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতে থাক। চৈতন্য বলিলেন আমার শাস্ত্রজ্ঞান নিতান্ত সামান্য; দীক্ষাকালে গুরুদেব আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে তোমার বেদান্তে কোন অধিকার নাই, তুমি কেবল একাগ্রচিত্তে হরিনাম জপ করিবে কেননা বৃহন্নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে :—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।"

গুরুদেবের আদেশে এই নামে পাগল হইয়াছি; উহা আর এক্ষণে না বলিয়া, না ভাবিয়া থাকিতে পারি না। বিশ্বের যে দিকে দেখি সেই দিকেই হরির শক্তি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাই; চক্ষু মুদ্রিত করিলেও তাঁহাকেই মনে পড়ে, শত আবরণেও তাঁহাকে ঢাকিতে পারি না। যখন তাঁহাকে ভাবি তিনি আমাকে কখন হাসান, কখন কাঁদান, কখন নাচান এইরূপে আমি তাঁহারই জন্য পাগল হইয়াছি। তাঁহার জন্যই পরোপকারে ব্রতী হইয়া দেশে দেশে, বনে বনে, তাঁহার মধুর নাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেছি। সভাস্থ সকলেই চৈতন্যের কথায় বিস্মিত হইয়া রহিলেন। বাক্‌প্রিয় পণ্ডিতগণ নত প্রকৃতির লোক নহেন; তাঁহারা আবার সগর্ব্বে চৈতন্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন হরির প্রেমে মুগ্ধজনকে কি তোমার গুরু বেদান্ত পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন? চৈতন্য বলিলেন বেদান্ত পড়িতে বা শুনিতে আমার কোন আপত্তি নাই এবং উহা আমি কোন দোষের কার্য্য বলিয়া মনে করি না। তবে ভাষ্যকারগণের দোষে বেদের মুখ্যার্থ যথার্থভাবে বিবৃত হয়না। তাঁহারা কেবল গৌণার্থের দ্বারা সূত্রের ভাব বিকৃত করিয়া নিজ নিজ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন; উহাতে উপকার না হইয়া লোকের প্রভূত অপকার হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন মত স্থাপন

ও সমর্থন করিতে চেষ্টা করেন বলিয়া প্রকৃত অর্থ বিকৃত হইয়া যায়। প্রকাশানন্দ বলিলেন এই কারণে আচার্য্য ভগবত্তা স্বীকার না করিয়া অদ্বৈতমত স্থাপনের জন্য বিভিন্ন অর্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। মীমাংসক বলেন ঈশ্বর কর্ম্মের অঙ্গ, সাংখ্য বলেন প্রকৃতিই জগতের আদি কারণ, ন্যায় বলেন বিশ্ব পরমাণুর সমষ্টি, মায়াবাদীরা বলেন ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, পাতঞ্জল বলেন ঈশ্বরই উপাস্য, ইনিই বেদে স্বয়ং ভগবান আখ্যা পাইয়াছেন। এইরূপ মত বৈষম্যে কিছুই স্থির হইতে পারে না; কিন্তু চৈতন্যদেবের ধর্ম্মমত এইস্থানে বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ ভগবানকে ব্রহ্ম বলিতেন এবং চিচ্ছক্তি স্বীকার করিতে পারা যায় না বলিয়া তিনি ব্রহ্মকে সত্তা নির্ব্বিশেষ স্বীকার করিতেন না; কেননা প্রাচীন বুধগণ ব্রহ্মে চিৎ, জীব ও মায়া এই ত্রিবিধ শক্তি আরোপিত করিয়াছেন।

প্রকাশানন্দের সহিত চৈতন্যের এইরূপ নানা প্রকার ধর্ম্মালোচনা হইয়াছিল। কাশীর পণ্ডিতগণ হতবুদ্ধি হইয়া চৈতন্যের অজস্র প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অধিকাংশই চৈতন্যের মত গ্রহণ করিলেন; ঘোর মায়াবাদী পণ্ডিতগণের মধ্যেও বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত হইল।

চৈতন্য নীলাচলে আসিলে রঘুনাথ দাস তাঁহার অনুগামী হয়েন। চৈতন্যের সহিত শান্তিপুরে দেখা হওয়ার, পর তিনি একপ্রকার উন্মত্তাবস্থায় ছিলেন। পুনঃ পুনঃ পলায়নের চেষ্টা

করিয়াও অনেক দিন পর্য্যন্ত সফল হইতে পারেন নাই। ইহার মধ্যে তিনি বৈষয়িক গোলযোগে পড়িয়া কিছু দিনের জন্য বন্দী-ভাবে ছিলেন। কারামুক্ত হইয়া একদিন রজনীতে কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া পাণিহাটী গ্রামে নিত্যানন্দের সঙ্গে মিলিত হইলেন। তথায় বৈষ্ণবদিগকে মহোৎসব দিয়া নীলা-চলে চৈতন্যের সহিত দেখা করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। ক্রমাগত দ্বাদশ দিন অনাহারে ভ্রমণ করিয়া তিনি নীলাচলে উপস্থিত হন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে অনুসন্ধানের জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু তিনি যে পথ দিয়া নীলাচলে আসিয়া-ছিলেন, সে পথে লোকের যাতায়াত ছিল না। নীলাচলে উপ-স্থিত হইয়া চৈতন্যের সহিত দেখা করিলেন। তিনিও সাদরে আলিঙ্গন করিয়া রঘুনাথকে যথোচিত ভক্তিশিক্ষা দিলেন। তাঁহার কঠোর বৈরাগ্যভাব দেখিয়া লোকে চমৎকৃত হইয়াছিল। দ্বারে দ্বারে অন্ন ভিক্ষা করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেন; সময়ে এতদূর বীতস্পৃহ ও ত্যাগপর হইয়াছিলেন যে চৈতন্যদেবও সময়ে সময়ে তাঁহার কঠোর আচরণকে ভাল বলিতেন না। ইহার কিছু পূর্ব্বেই রূপ ও সনাতন নিজ নিজ সম্পত্তির অবশিষ্ট-ভাগ যোগ্যপাত্রকে দান করিয়া চৈতন্যের সঙ্গী হইবার জন্য নীলাচলে আসিয়াছিলেন। নীলাচলে আবার ভক্তের মেলা বসিল! রামানন্দ, সার্ব্বভৌম, রূপ, সনাতন, রঘুনাথ প্রভৃতি ভক্তগণের সঙ্গে চৈতন্য নিরন্তর হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগি-

লেন। দাক্ষিণাত্যে সেতুবন্ধ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বৃন্দাবন, পূর্ব্বে শ্রীহট্ট এবং সাগরতীরে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত হরিনাম কীর্ত্তন, ভক্তি বিতরণ করিয়া শেষবারের জন্য নীলাচলে বাস করিতে লাগিলেন। চতুর্ব্বিংশতি বৎসর গৃহাশ্রমে, ছয় বৎসর তীর্থ পর্য্যটনে এবং জীবনের অবশিষ্ট অষ্টাদশ বৎসর শ্রীক্ষেত্রে কাটাইয়াছিলেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি কত রাজাকে বৈরাগী, উজিরকে ভিখারী, পাপীকে ধার্ম্মিক, পাষণ্ডকে ভক্ত করিয়াছেন, তাহা যথার্থরূপে নির্ণয় করা কঠিন। যতদিন তিনি এসংসারে ছিলেন ধর্ম্মের ভার লইয়া তিনি দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়াছেন ও নাম প্রচার করিয়াছেন। ধন, মান, জ্ঞান কিছুরই গৌরব প্রত্যাশা করিতেন না। রমণীর সহিত বাস করা দূরে থাকুক তাহাদের মুখ দেখিতেও পাপ মনে করিতেন। অনেকে তাঁহাকে এই জন্য নিন্দা করিতেন; সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া যখন চৈতন্য প্রথমে শান্তিপুরে উপস্থিত হন তখন তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। নীলাচলে অবস্থিতি কালে তিনি একদিন যমেশ্বর টোটায় যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে স্ত্রীকণ্ঠ নিঃসৃত হরিনামের গান শুনিয়া এত মুগ্ধ হইলেন যে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যেদিক হইতে কণ্ঠস্বর আসিতেছে সেইদিকে দৌড়াইতে লাগিলেন। সঙ্গে গোবিন্দ নামে একজন অনুগত ভৃত্য ছিল সে চৈতন্যের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তাঁহার পশ্চাৎধাবমান হইল। চৈতন্য যেমন

স্ত্রীলোকটীকে আলিঙ্গন করিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময়ে ভৃত্যটী বলিয়া উঠিল "স্ত্রীলোক"। চৈতন্য স্ত্রীলোকের নাম শুনিবা মাত্রই চমকিয়া উঠিলেন; আর তথায় না দাঁড়াইয়া দূরে আসিলেন। গোবিন্দও সঙ্গে সঙ্গে আসিল; গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন তুমি আজ আমার ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছ; আর একটু বিলম্ব হইলেই আমি ধর্ম্মচ্যুত হইতাম। নীলাচলে ভগবান আচার্য্য নামে চৈতন্যের একজন অনুগত শিষ্য ছিলেন। শেষাবস্থায় চৈতন্যদেব কাশীশ্বর মিত্রের বাটীতেই থাকিতেন এবং প্রায়ই শিষ্যগণের বাটীতেই নিমন্ত্রিত হইয়া ভিক্ষালব্ধ খাদ্যদ্রব্য আহার করিতেন। একদিন ভগবান আচার্য্য নিজ গুরুকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। ভিক্ষা দ্বারা উৎকৃষ্ট তণ্ডুল সংগ্রহের জন্য ছোট হরিদাসকে মাধবীদেবী নাম্নী একটী প্রাচীনা বৈষ্ণবীর নিকট পাঠাইয়া দেন। চৈতন্যদেব এই সংবাদ পাইয়া সকলকে বলিয়া দিলেন যে আমি আর ছোট হরিদাসের মুখ দেখিব না; তাহাকে আমার আশ্রমে আসিতে নিষেধ করিও। সকলে ইহা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল এবং পরে ছোটহরিদাসকে পুনরায় শিষ্যশ্রেণীভুক্ত করিবার জন্য অনেক প্রকার অনুরোধ করিল। চৈতন্যদেব কাহারও প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন না। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে ছোটহরিদাস এই পাপের অনুশোচনায় প্রয়াগে ত্রিবেণীর জলে আত্মসমর্পণ

করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের প্রতি তিনি এইরূপ কঠোর ব্যবহার করিতেন। এসম্বন্ধে বৈষ্ণবেরা বলেন যে তাঁহাতেই রাধাকৃষ্ণ দুইজন একত্রে অবস্থান করিতেন। "একাধারে রাধাকৃষ্ণ বিরাজে" এই বলিয়া বৈষ্ণবেরা ভাবে মত্ত হইয়া পড়েন এবং স্ত্রীলোকের প্রতি কঠোর ব্যবহারে কোন দোষারোপ করেন না। বৈষ্ণবেরা রূপ গোস্বামীর নিম্ন লিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আপনাদিগের মত সমর্থন করিয়া থাকেন :—

"রাধাকৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মাদেকাত্মানা-
বপি ভূবি পুরা দেহভেদং গতৌতৌ। চৈতন্যাখ্যং প্রকট
মধুনা তদ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং রাধাভাব দ্যুতি সুবলিতং
নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং ॥"

আবার যাঁহারা বলেন যে চৈতন্যদেব রাধাকৃষ্ণকে আধ্যাত্মিক ভাবে হ্লাদিনী শক্তিস্বরূপে পূজা করিতেন; তাঁহাদের মতে চৈতন্যে প্রকৃতিও পুরুষ উভয়ই ছিল। কাযেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। এসকল বিষয়ের মীমাংসা হওয়া বড় সুকঠিন; একাধারে স্ত্রী-পুরুষের অবস্থান হওয়া বর্ত্তমান শতাব্দীর বিশ্বাসযোগ্য নহে। চৈতন্যদেব নিজ শিষ্যগণকে বিবাহ করিতে উপদেশ দিতেন; কিন্তু নিজে বিবাহ করিয়া স্ত্রীর প্রতি নির্ম্মম ব্যবহার করিতেন কেন তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে

না। এই স্থলে তাঁহার চরিত্রের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। অনেকে নানা যুক্তি দেখাইয়া ইহাও সমর্থন করিয়া থাকেন; কিন্তু সে যুক্তিগুলির প্রতি আস্থা স্থাপন করিতেও আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় সঙ্কুচিত হয়েন।

সময় অনন্তে মিশিবার জন্য ছুটিতেছে। কেহ তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না। কতজনকে সম্পদে, কতজনকে বিপদে ফেলিয়া সময় দৌড়াইতেছে; কাহারও দিকে ফিরিয়া চাহে না। কাহারও জীবন অসম্পূর্ণ বলিয়া অপেক্ষা করে না। যতই সময় বহিয়া যায় ততই প্রাণীর বাঁচিবার ইচ্ছা বলবতী হয়; কিন্তু সে ইচ্ছা ফলবতী হয় না। চৈতন্যদেব জগতের জন্য এত করিলেন, বাঁচিয়া থাকিলে আরো কত করিতে পারিতেন কিন্তু সময় তাঁহার দিকে চাহিল না। সময় যতই চলিয়া যাইতে লাগিল তাঁহার লীলাও শেষ হইয়া আসিতে লাগিল। নীলাচলে ভক্তগণের সঙ্গে কেবল প্রেমালাপে উন্মত্ত হইলেন; এই উন্মত্ত ভাব পাগলের ভাবে পরিণত হইল। তিনি আর আশ্রমে থাকিতে চাহেন না; ছুটিয়া কখন বা বনের দিকে কখন বা নদীর দিকে যাইতে চেষ্টা করিতেন। ভক্তগণ সর্ব্বদাই তাঁহাকে নিকটে রাখিতে প্রয়াস পাইতেন; কিন্তু তিনি প্রকৃত পাগল হইয়াছেন। যে প্রেমে শত শত রাজাকে ভিক্ষুক করিলেন সেই প্রেমের চরম অবস্থা—মহাভাবের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তাঁহার মুখে ভক্তি

ভিন্ন আর কোন কথাই লোকে শুনিতে পায় না। "হরি আমার কোথায় রহিল" এই বলিয়া সময়ে সময়ে বিকট চীৎকার করিতেন। সকলেই জানিতে পারিল মহাপুরুষের শেষ লীলা আসন্ন। তিনি এরূপ উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন যে তাঁহাকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া প্রহরীর তত্ত্বাবধানে রাখিতে হইত। ক্রমে ক্রমে মহাভাবের লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইতে লাগিল। তিনি এই সময়ে ভক্তির গানে স্বতঃই মূর্চ্ছিত হইতেন এবং ভক্তগণের মুখে হরিনাম না শুনিলে চৈতন্য পাইতেন না। লিখিত আছে যে এই সময়ে তিনি একদিন ভাবোন্মত্ত হইয়া কূপে পড়িয়া আকুলস্বরে "হরি কোথায় রহিলে" বলিয়া ঘন ঘন চীৎকার করিতেছিলেন; পরে ভক্তগণ আসিয়া তাঁহাকে কূপ হইতে উত্তোলন করেন।

এই সময়ে একদিন চৈতন্যদেব ভক্তগণের সঙ্গে জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে টোটা নামক পর্ব্বতে বেড়াইতে যান। তিনি কোথায় পলাইয়া যাইবেন মনে করিয়া সকলেই সতর্ক ছিলেন। হরিনাম গান করিতে করিতে সকলেই যখন বাহ্য-জ্ঞানশূন্য হইয়াছেন তিনি কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কেহই জানিতে পারিল না যে তিনি কোন সময়ে কোন পথে অদৃশ্য হইয়াছেন। হরিনাম গান শেষ হইলে সকলেই দেখেন যে চৈতন্য নিকটে নাই; পর্ব্বতের সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহাকে পাওয়া গেল না। ভক্ত-

গণের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল ; প্রভু কোথায় গেলেন এই ভয়ে সকলেই ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। নিকটবর্ত্তী গিরিপথ দিয়া একজন ধীবর যাইতেছিল দামোদর তাঁহাকে দেখিয়া আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি একটী সন্ন্যাসীকে এই পথে যাইতে দেখিয়াছ? ধীবর বলিল আজ আমার জালে একটী অৰ্দ্ধমৃত বৈরাগী পড়িয়াছিল আমি তাহাকে নদী-তীরে ফেলিয়া আসিয়াছি। সকলেই নদীতীরে দৌড়িয়া আসিয়া দেখেন চৈতন্যদেব অচেতন অবস্থায় শবের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছেন। সকলেই একস্বরে হরিনাম গান করিতে লাগিলেন ; হরিনাম গানে জ্ঞান পাইয়া চৈতন্য চাহিয়া দেখি-লেন ভক্তগণ প্রাণের ব্যাকুলতায় হরিনাম গান করিতেছেন ; এইরূপে সেবারও রক্ষা পাইলেন।

চৈতন্যদেব যে কয়েক বৎসর নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন, প্রতি বৎসরেই জননীর ও গৌড়ীয় ভক্তগণের কুশলবার্ত্তা জানি-বার জন্য জগদানন্দকে নবদ্বীপে পাঠাইতেন। তিনি মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এজগতে তাঁহাকে আর বেশীদিনের জন্য কষ্ট সহ্য করিতে হইবে না। এবারে জগদানন্দকে নব-দ্বীপে পাঠাইবার সময় বলিয়া দিলেন আমাকে আর বেশীদিন এজগতে থাকিতে হইবে না। এই সঙ্গে বৃদ্ধভক্ত অদ্বৈতাচার্য্য চৈতন্যকে বলিয়া পাঠাইলেন :—

"প্রভুকে কহিও আমার কোটী নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার।।
বাউলকে কহিও লোক হইল আউল।
বাউল কহিও হাটে না বিকায় চাউল।।
বাউলকে কহিও কাযে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছেন বাউল।।"

জগদানন্দ নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়া অদ্বৈতাচার্য্য যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন অবিকল তাহাই চৈতন্যকে বলিলেন; তিনি উহার অর্থ বুঝিয়া হাসিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ মহাভাবের পূর্ণ বিকাশ হইতে লাগিল; পঞ্চভূতের দেহ আর কত সহ্য করিবে? সেই অনাদিপুরুষের অনন্ত চিন্তায় তিনি আপনাকে ভুলিয়া তন্মগ হইয়া গেলেন। ভক্তি, প্রেম, সাম্য, প্রীতি, উপাসনায় যাঁহার কীর্ত্তি জগতের সৃষ্টি প্রবাহের সহিত অনন্ত কাল জীবন্তভাবে ভাসিয়া যাইবে তাঁহার জীবলীলা শেষ হইতে চলিল! যিনি ভবিষ্যদ্বংশের মুক্তির সুগম পথ দেখাইয়া গেলেন তিনি আজ মুক্তি দ্বারে উপস্থিত! হরিনাম ভিন্ন তাঁহার আর কোন স্নেহের নাম ছিল না; তাই তিনি প্রাণ-বায়ুর শেষ নিশ্বাসের সঙ্গেও হরিনাম উচ্চারণ করিতেছিলেন। ভক্তগণ বুঝিতে পারিল যে তাঁহার জীবনের আর কোন আশা নাই; তাই যে নামে তিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছেন মুক্তস্বরে চৈতন্যদেবের সম্মুখে সেই নাম গান করিতে লাগিল। জগ-

তকে ত্যাগ করিয়া, জগতের কষ্ট হইতে মুক্ত হইতেছেন তথা-পিও জগতের প্রাণীকে ছাড়িতে চাহিতেছেন না; কথা কহি-বার শক্তি নাই তথাপিও যে বিশ্বাস জগতে ঘোষণা করিয়াছেন তাহাই বার বার বলিতে লাগিলেন, যে বিশ্বাসে মুক্তির পথ দেখাইয়াছেন তাহাই উপদেশ দিতে লাগিলেন। জগতকে ত্যাগ করিতে যাইতেছেন তথাপিও জগতকে শিক্ষা দিতে বিরত হইতেছেন না। পার্শ্বে চিরসুহৃৎ দামোদর ও রামানন্দকে উপ-বিষ্ট দেখিয়া ক্ষীণস্বরে বলিলেন এযুগে নাম কীর্ত্তনই পরমার্থ লাভের শ্রেষ্ঠতম উপায়; ইহাতেই সকল অনিষ্টের বিনাশ ও পবিত্র প্রেমের উদয় হইয়া থাকে। তারপর নিজের রচিত নিম্ন-লিখিত কয়েকটী শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বুঝাইয়া দিলেন।*

"নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি, স্তত্রার্পিতো নিয়মিতঃ স্মরণেন কালঃ। এতাদৃশী তবকৃপা ভগবন্মমাপি, দুর্দ্দৈবমীদৃশ-মিহাজনি নানুরাগঃ॥"

হে ভগবন্! তুমি ভক্তগণের ইচ্ছানুসারে নানা নামে অভি-হিত হইয়াও তাহাতেই সমগ্র শক্তির পরিচয় দিতেছ। দেশ কালভেদে তোমার নাম লইবার কোন নিয়মই নাই; কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ এরূপ কৃপা থাকিতেও তোমার নামে আমার অনুরাগ জন্মিল না। কিরূপ ভাবে নাম লইলে প্রেমের উদয় হয় তাহাও স্বরূপ এবং রামানন্দকে বলিলেন:—

* শ্লোক কয়েকটী পদ্যাবলী হইতে গৃহীত হইয়াছে।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ॥"

যিনি নিজে অমানী হইয়া অন্যকে মান দান করেন, নিজেকে তৃণ অপেক্ষাও নীচ মনে করেন এবং তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু হয়েন তিনিই হরিনাম কীর্ত্তন করিতে পারেন। পরে নিজের দৈন্যতা প্রকাশ করিয়া শুদ্ধ ভক্তি প্রার্থনায় বলিতে লাগিলেন :—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে, ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

হে জগদীশ! তোমার নিকটে আমি ধন, জন, সুন্দরী কিম্বা কবিতা কামনা করি না, কেবল তোমাতে আমার শুদ্ধ ভক্তি হউক ইহাই আমার প্রার্থনা। প্রেম বিষয়ে আবার নিজের দৈন্যতা প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন :—

"নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি॥"

তোমার নাম গ্রহণে কবে আমার চক্ষে অশ্রুধারা বহিবে, কথা গদ্গদ হইবে, কণ্ঠ রোধ হইবে এবং পুলকে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে। পরিশেষে নিজের নিম্নলিখিত শ্লোকটী পাঠ করিয়া জীবলীলা সম্বরণ করিলেন।

"যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেণ মে॥"

১৪৫৫ শকে অষ্টচত্বারিংশ বৎসর বয়সে চৈতন্যদেব দেহ ত্যাগ করিলেন। যে মহাভাবের জন্য তিনি শেষাবস্থায় পাগল হইয়া ছিলেন তাহা তিনি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের জন্য তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। দেশ দেশান্তরে হরিনাম প্রচার করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের যে জীবনী-শক্তি শত শত নর নারীর হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছেন তাহা আজও অনেক স্থানে অবিকৃত রহিয়াছে। ধর্ম্মজগতে চৈতন্যসদৃশ মহাপুরুষ অতি দুর্লভ। আজ প্রায় চারিশত বৎসর সময়ের অনন্ত এবং অবিশ্রান্ত স্রোতে ভাসিয়া গেল। কিন্তু একটী বই আর চৈতন্য এদেশে জন্মিল না! রাজনীতি, সমাজনীতি উন্নত হইতেছে কিন্তু ধর্ম্মনীতি সকলের নিম্ন সোপানে বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। আর্য্যসমাজে যেরূপ প্রাচীন সময়ে ধর্ম্ম শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল, সে সময়ে অতি অল্প দেশেই ধর্ম্মের নাম বিদিত ছিল। আজ সে আর্য্যসমাজ শত শত শিথিলমূল সম্প্রদায়ে বিভক্ত। আজ আর চৈতন্যের ন্যায় কেহ প্রেমের পূজা করে না; স্বার্থকে অকাতরে বলি দেয় না; দেশে দেশে ভিখারীর বেশে ভক্তি বিতরণ করে না। কেবল স্বার্থের পূজায়, বাহ্যাড়ম্বরের মত্ততায়, জ্ঞান-কাণ্ডের গভীর আন্দোলনে ভারতবাসী ব্যস্ত, উৎসুক ও তৎপর। একদিন ভারতভূমি পুণ্যভূমি, ভারতবাসী আদর্শজাতি ছিল। একদিন বেদের পবিত্র গানে ভারতাকাশ থর থর কাঁপিয়াছিল। এক

দিন এভারত কত ঋষি, কত তপস্বী কত মহাপুরুষের আশ্রম ছিল। আজ আর সে বেদগানের গভীর ধ্বনি শুনিতে পাই না; সে ঋষির সে তপস্বির সে মহাপুরুষের ছায়াও দেখিতে পাই না। ধর্ম্মজগত দিন দিন অবনত হইয়া আসিতেছে, জানিনা আজ হইতে প্রলয়ের সেই ভীষণকাল কত বৎসরের ব্যবধানে থাকিয়া অলক্ষ্যভাবে অগ্রসর হইতেছে। আমরা যথার্থই এসময়ে একজন চৈতন্যের অভাবে পড়িয়াছি! ঈশ্বর জানেন ভাবী চৈতন্যের জন্মদিন কবে আসিবে!!

সমাপ্ত।

——oo——

চৈতন্যের ধর্ম্ম।

ঊনবিংশ শতাব্দী প্রায় শেষ হইতে চলিল; ধর্ম্মনীতি রাজনীতি ও সমাজনীতির আন্দোলনে ভারতবাসী উৎসাহিত, দৃঢ়কল্প ও একপ্রাণ; ধর্ম্মরাজ্যে ধর্ম্মের সংগ্রাম চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে; এসংগ্রামের শেষ নাই, সন্ধি নাই, বিচ্ছেদ নাই। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে না আছে এমন নীতি নাই, না আছে এমন ধর্ম্ম নাই, না আছে এমন প্রাকৃতিক পদার্থ নাই; ভারতের বক্ষে জাতি, নীতি ও ধর্ম্মের সংঘর্ষণে যত রক্তপাত, যত নরহত্যা, যত গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে কোন দেশে সেরূপ হইয়াছে কি না সন্দেহ। বাহুবল, সৈন্যবল, ধনবল প্রভৃতি সকল বলই ধর্ম্মবলের নিকট পরাভূত হয়; ধর্ম্মবলে বলীয়ান জাতির অবনতি নাই, ধ্বংস নাই; ঊর্দ্ধদিকে যে জাতির আকর্ষণ থাকে, ঊর্দ্ধে উঠিবার জন্য যে জাতির আন্তরিক যত্ন ও উৎসাহ থাকে, সে জাতির পদস্খলন হইলেও এক পদ নিম্নে পড়িয়া যায়, পরক্ষণেই দুই পদ ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে; ইহা বিশ্বনিয়ন্তার অখণ্ডনীয় নিয়ম। আজ কাল প্রাচীন ধর্ম্ম, প্রাচীন আদর্শবীর ও বিস্মৃতমহাপুরুষদিগের জীবন লইয়া যেরূপ আন্দোলন হইতেছে তাহাতে আশা হয় আমরা একদিন ভারতের ভাষা, নীতি ও ধর্ম্মের উন্নতাবস্থা দেখিয়া কৃতার্থ হইব।

চৈতন্যদেব ধর্ম্মবীরগণের আদর্শ স্থানীয়; কিন্তু তাহার ধর্ম্মমতের নিগূঢ় তত্ত্বগুলি এত অপরিজ্ঞেয় যে তৎসমুদয় উদ্ধার করা একরূপ দুরূহ ব্যাপার। সকলেরই একপ্রকার ধারণা আছে যে তিনি বিষ্ণুভক্ত ছিলেন; কৌপীন পরিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ও হরিনাম প্রচার করিতেন; এধারণা সম্পূর্ণ সত্য। প্রাচীন সনাতন ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত; প্রত্যেক সম্প্রদায়ের শাস্ত্র ভিন্ন, সাধন প্রণালী ভিন্ন, উপাস্য দেবতা ভিন্ন; কিন্তু সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের মূলেই বেদের প্রাধান্য বর্ত্তমান। ইস্লাম ধর্ম্মে কোরাণ ও খ্রীষ্ট ধর্ম্মে বাইবেল যেমন আদৃত; বৈষ্ণব ধর্ম্মে ভাগবতও তদ্রূপ কিন্তু তথাপি——

"রসোবৈসঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতীতি শ্রুতিঃ।"

এই শ্লোকার্দ্ধই বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল ভিত্তি; তাহা হইলে ভাগবতের মূলেও বেদ আছে স্বীকার করিতে হইবে। নবম শতাব্দীর পূর্ব্বে যে ভাগবত জন সমাজে প্রকাশিত হইয়াছিল একপ কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না; বিশেষতঃ দশম শতাব্দীতে শটকোপ, যামুনাচার্য্য ও রামানুজ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন এবং ভাগবতই যে বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল গ্রন্থ তাহা ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে:—

"নিগম কল্পতরোর্গলিত ফলং
শুক মুখামৃত দ্রব সংযুক্তং
পিবতো ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুমুহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ

গ্রন্থোষ্টাদশ সাহস্রঃ
শ্রীমদ্ভাগবতা বিধঃ
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং
সারং সারং সমুদ্ধৃতং
সর্ব্ব বেদান্ত সারং হি
শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে।"

শঙ্করাচার্য্য প্রণীত বৈষ্ণবতত্ত্ব অবলম্বনে রামানুজ, বিষ্ণু-স্বামী, নিম্বাদিত্য ও মাধবাচার্য্য চারিটী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন; এই চারিজন হইতে চারিটী সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে। এই চারি জনের পরে আমরা চৈতন্যের অবতারণা দেখিতে পাই; পূর্ব্বোক্ত চারি সম্প্রদায়ের তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত চৈতন্যদেব জীবের চরম প্রয়োজন—সমাধিযোগে ব্রজ-ভাবগত রসাশ্রিত কৃষ্ণানুশীলনই জীবের নিয়ত কর্ত্তব্য; যেহেতু ঐ ভাবটী জীবের প্রাপ্য বিষয়ের অত্যন্ত সন্নিকর্ষ এবং পরম মাধুর্য্য স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের গাঢ় মধুর রসের আলোচনাই চরম কর্ত্তব্য—এই দুই তত্ত্বের সম্পূর্ণ জ্ঞান বিস্তার করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তিন তত্ত্বের বিশেষ ও সম্পূর্ণ আলোচনা দৃষ্ট হয়; চৈতন্যদেব নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের সাহায্যে রূপ, সনাতন, জীব, গোপাল ভট্ট, রামানন্দ সার্ব্বভৌম প্রভৃতি ভক্তগণের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সম্বন্ধতত্ত্ব স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করেন ও অভিধেয়তত্ত্বে কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া

কার্য্য সংক্ষেপ এবং প্রয়োজন-তত্ত্বে ব্রজরস আস্বাদন করিবার অত্যন্ত সরল উপায় দেখাইয়াছেন। তাহার পর আমরা পরমার্থতত্ত্বের আলোচনা ও উন্নতি দেখিতে পাই। শ্রীকৃষ্ণসংহিতায় লিখিত আছে "সরস্বতী-তীরে ব্রহ্মাবর্ত্তের কুশময় ভূমিতে পরমার্থতত্ত্বের জন্ম হয়, বদরিকাশ্রমের তুষারাবৃত ভূমিতে ইহার বাল্যলীলা সম্পাদিত হয়, গোমতীতীরে নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে ইহার পৌগণ্ডকাল অতিবাহিত হয়, দ্রাবিড়দেশে কাবেরী শ্রোতস্বতীর রমণীয় উপকূলে ইহার যৌবন কার্য্য সকল দৃষ্ট হয় এবং জগৎ পবিত্রকারিণী জাহ্নবীতীরে নবদ্বীপ নগরে ইহার পরিপক্কাবস্থা পরিদৃশ্য হয়।"

ঈশ্বর রসস্বরূপ আনন্দময; সমস্ত জগতের স্নেহ দিয়াও তাঁহাকে লাভ করা দুঃসাধ্য; তিনি আনন্দের আধার; আনন্দের আধার বলিয়া তাঁহাকে উপলব্ধি করিলে ভক্তি ও প্রেমে হৃদয় পূর্ণ হয়। এই আনন্দস্বরূপ ব্যক্তিত্বপূর্ণ ঈশ্বরের উপাসনাতে বৈষ্ণবেরা পঞ্চবিধ অবস্থা অনুভব করেন; এই পঞ্চবিধ অবস্থাকে পঞ্চরস বলে। পঞ্চরস যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর; এই কয়েকটী সম্বন্ধ হৃদয়ে উত্তমরূপে অনুভব করাই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রধান মত। শান্তরসই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া বৈষ্ণবেরা অগ্রহাতিশয়ে ইহার উৎকর্ষ সাধনের বিশেষ চেষ্টা করেন; সংসার-যন্ত্রণার মুক্তির পর জীবের পরব্রহ্মে অবস্থানজনিত অবস্থাকে শান্তরস বলে। শান্তরসে ঈশ্বর,

চৈতন্যের ধর্ম্ম।

দাস্যরসে প্রভু, সখ্যরসে সখা, বাৎসল্যরসে পিতা ও মধুররসে হৃদয়নাথ বলিয়া বৈষ্ণবেরা সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষের স্বর্গীয় ভাব অনুভব করেন। উপরোক্ত কয়েকটী সম্বন্ধ জনিত আত্মার অবস্থা ভেদে বৈষ্ণবেরা মুক্তি চতুর্ব্বিধ নির্দ্দেশ করেন। যথা—সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি ও সারূপ্য। চৈতন্যের মতে ভগবান ইন্দ্রিয়াতীত নিত্য বিগ্রহ; কিন্তু তিনি ভগবানের ব্যক্তিত্ব ও আধ্যাত্মিকতা উভয়ই স্বীকার করিতেন বলিয়া মায়াবাদ ও মুক্তি রূপ নির্ব্বাণ মহাভ্রমে তাঁহাকে ভ্রান্ত হইতে হয় নাই। তিনি ভগবানের ব্যক্তিত্ব এই বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন "ঈশ্বর কেবল নিরাকার অন্ধ শক্তিও নহেন ও কোন দেহ সমন্বিত অবতার ও নহেন; তাঁহার নিত্য বিগ্রহ আছে। এই চর্ম্ম-চক্ষুতে যেমন বাহ্যবস্তু দর্শন করা যায় তেমনি আত্মার চক্ষুতে ঈশ্বরের ঐ বিগ্রহ দর্শনীয় হয়।" "বিশ্বাস অদৃশ্য পদার্থের প্রমাণ" অর্থাৎ বিশ্বাস আত্মার চক্ষু, তাহা দ্বারা ঈশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাই চৈতন্যদেবের ধর্ম্মের মূল ভিত্তি। তিনি রাধাকৃষ্ণকে আধ্যাত্মিক ভাবে আনন্দদাতা বলিয়া স্বীকার করিতেন ও আত্মার আনন্দদায়িনী শক্তিকে রাধা দেখিতেন।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে চৈতন্যদেব সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তিনি তত্ত্বের বিশেষ জ্ঞান বিস্তার করেন একণে তৎসম্বন্ধে তাঁহার মত বিবৃত হইতেছে।

সম্বন্ধ—চৈতন্যদেবের মতে নিজের আত্মার অস্তিত্ব হইতে বিষয় ও অন্যঅন্য বস্তুর আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়; যদি আমি নাথাকি তাহা হইলে যে আর কেহ আছে একথা সহজে প্রতীতি হয়না; আত্মপ্রত্যয় দ্বারা নিজের অস্তিত্ব স্থির করিয়া অন্য আর একটী আত্মার অস্তিত্ব বুঝিতে হইবে; সে আত্মা পরমাত্মা; আবার জড় জগত দেখিলে আর একটী পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহা হইলে প্রকৃত পক্ষে বস্তু তিনটী—আত্মা, পরমাত্মা ও জড়জগত। রামানুজাচার্য্য এই বস্তুত্রয়কে চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর নাম দিয়া বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন; তৎসমুদয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সম্ভবপর নহে।

প্রয়োজন—আত্মার স্বধর্ম্ম গ্লানিই মনুষ্যের অপরাধ; এই অপরাধেই মনুষ্য আধ্যাত্মিক, দৈবিক ও ভৌতিক ক্লেশে প্রপীড়িত হয়। স্বধর্ম্মবৃত্তি কখনও বিনষ্ট হয় না কেবল অনুশীলনের অভাবে হীনতেজ হয়; প্রীতিই স্বধর্ম্মশীলের একমাত্র প্রয়োজন।

অভিধেয়—"যদ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধি হয় তাহাকে অভিধেয় বলে"; অভিধেয় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের নাম কর্ম্ম; কর্ম্ম তিন প্রকার নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। যাহা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য তাহা নিত্য; কোন ঘটনা ক্রমে যাহা কর্ত্তব্য তাহা নৈমিত্তিক ও লাভের ইচ্ছায়

চৈতন্যের ধর্ম্ম।

যাহা কর্ত্তব্য তাহা কাম্য। জ্ঞান দ্বিবিধ; ব্রহ্মজ্ঞান ও ভগবৎজ্ঞান; ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা আত্মার ব্রহ্ম-নির্ব্বাণরূপ ফলের উদ্দেশ্য থাকে; নির্ব্বাণের পর আত্মার স্বতন্ত্র অবস্থান ব্রহ্মজ্ঞানীরা স্বীকার করেন না; আত্মা মুক্ত হইলে নির্ব্বিশেষ হইয়া ব্রহ্মের সহিত ঐক্য হইয়া পড়ে। যিনি ধ্রুব ব্রহ্মকে উপাসনা করেন, ইন্দ্রিয়কে সংযত করেন, জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মানুসন্ধান করেন, তিনি অবশেষে ভগবানকেই প্রাপ্ত হন; এই জ্ঞানকে ভগবৎজ্ঞান বলে।

যত প্রকার অভিধেয় উল্লেখ হইল তন্মধ্যে ভক্তিই প্রধান; ইহাই চৈতন্যদেবের আদরের ধন, মুক্তির মন্ত্র ও হৃদয়ের বল। "ভক্তি পরানুরক্তিরীশ্বরে" ঈশ্বরের প্রতি আন্তরিক অনুরক্তিকে ভক্তি বলে; ভক্তি দুই প্রকার ঐশ্বর্য্যপরা ও মাধুর্য্যপরা। ভক্তি যখন ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য ও মহিমা চিন্তায় উত্তেজিত হয় তখন তাহাকে ঐশ্বর্য্যপরা বলে; যখন ঈশ্বরের মধুর ভাবের চিন্তায় মন বিগলিত হইয়া ভক্তি উদ্রিক্ত হয় তখন তাহাকে মাধুর্য্য-পরা বলে। চৈতন্যের উভয় প্রকারের ভক্তিই ছিল; ভক্তি যখন ঐশ্বর্য্যপরা হয় তখন সাধকের মনে দাস্যরসের আবির্ভাব হয়; যখন মাধুর্য্যপরা হয় তখন সাধকের মন সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে অভিভূত হয়। চৈতন্যদেব ভক্তির তিনটী অবস্থা বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলেন যথা:—সাধন, ভাব ও প্রেম।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।।"

ভাগবতোক্ত এই নবাঙ্গসাধন ভক্তিলাভের প্রধান উপায়; ভাব ও প্রেমভক্তি কেবল ভক্তির উন্নত অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কি কি লক্ষণ দ্বারা ভক্তের হৃদয় জানিতে পারা যায় তাহাও ভাগবতে লিখিত আছে যথাঃ—

"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্ম্মানশূন্যতা,
আশাবন্ধ সমুৎকণ্ঠা নাম গানে সদা রুচিঃ।
আসক্তিস্তদ্ গুণাখ্যানে, প্রীতিস্তদ্ বসতিস্থলে,
ইত্যাদয়োঽনু ভাবা স্যুর্জাত ভাবাঙ্কুরে জনে।"

ক্ষমা, বৃথা কার্য্যে সময়পাত না করা, সর্ব্ববিষয়ে আসক্তি-শূন্যতা, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ সমুৎকণ্ঠা, ভগবানের নামগানে সর্ব্বদা অভিরুচি, ভগবানের গুণ কথা শ্রবণে আসক্তি ও তাঁহার বসতিস্থলে প্রীতি এই কয়েকটী ভক্তের লক্ষণ।

চৈতন্য দেবের মতে আত্মা জ্ঞানস্বরূপ অতএব স্বপ্রকাশ ও জড়ের প্রকাশক; ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে আত্মার দ্বাদশটী লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে; চৈতন্যদেবও ইহা স্বীকার করিতেন তাহার কোন সন্দেহ নাই; কেননা ভাগবতই তাঁহার একমাত্র ধর্ম্মশাস্ত্র ছিল, ভাগবতের দ্বারাই তাঁহার ধর্ম্মমত পুষ্ট হইয়াছিল। ভাগবতে আত্মা সম্বন্ধে লিখিত আছে যে আত্মা নিত্য অর্থাৎ ক্ষণ-ভঙ্গুর নহে;

অব্যয় অর্থাৎ শরীর নাশ হইলে তাহার নাশ নাই, শুদ্ধ অর্থাৎ প্রাকৃত ভাব রহিত; এক অর্থাৎ দ্বৈতভাব রহিত; ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ দ্রষ্টা; আশ্রয় অর্থাৎ লিঙ্গের আশ্রিত নয়; অবিক্রিয় অর্থাৎ দেহগত ভৌতিক বিকার রহিত, বৈষ্ণবদিগের মতে বিকার ষড়বিধ যথা—জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ, স্বদৃক্ অর্থাৎ আপনাকে আপনি দেখে; হেতু অর্থাৎ শরীরের ভৌতিক সত্তা, ভাব ও কার্য্যের মূল; ব্যাপক অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট স্থান ব্যাপী নয়; অসঙ্গী অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াও প্রকৃতির গুণসঙ্গী নয়, অনাবৃত অর্থাৎ ভৌতিক আবরণে আবদ্ধ হয় না।

বৈষ্ণব জীবনে সপ্ত প্রকার ভাগবদনুশীলনের একান্ত প্রয়োজন; ভাগবতে এই সপ্তবিধ ভাগবদনুশীলনের বিষয় বিস্তারিত লিখিত হইয়াছে; চৈতন্যদেবও এই সপ্তপ্রকার অনুশীলন শিষ্যগণকে শিক্ষাদিতেন এবং নিজেও পালন করিতেন, সপ্তবিধ অনুশীলন যথাঃ—চিদগত, মনোগত, দেহগত, বাক্যগত, সম্বন্ধগত, সমাজগত ও বিষয়গত অনুশীলন, প্রত্যেক প্রকার অনুশীলনের বিশেষ উপায়ও নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

চৈতন্যদেবের ধর্ম্মমতের স্থূল তত্ত্ব লিখিত হইল; প্রকাণ্ডকায় ভাগবত যাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্র তাঁহার ধর্ম্মমত এ সামান্য গ্রন্থে সবিশেষ বিবৃত করা অসাধ্য।